Quest

An Academic Journal

Quest

An Academic Journal

ULUBERIA COLLEGE
Uluebria, Howrah

Quest

An Academic Journal

Editor :

Dr. Aditi Bhattacharya

Co-ordinating Editor :

Dr. Ajoy Mukherjee

Editorial Board :

Dr. Prabir Pal, Dr. Siddhartha Bhattacharya,
Dr. Biswajit Chowdhury, Sri Dipak Nath,
Dr. Jayasree Sarkar, Sm. Chandana Samanta,
Sri Uttam Purkait

Quest
An Academic Journal
Vol-3, 2007

Printed by : Charulekha Printer
Uluberia, Howrah
Ph. No. - 26610076

Frontispiece : *Portrait of Socrates*

Courtesy :
Living Biographies of Great Philosophers
By Henry Thomas and Dar Lee Thomas
Garden City Publishing Co. Inc.
New York

Content

nguage and Literature :

লা লৌকিক ছড়ায় পশুপাখী (২)	চন্দনা সামন্ত	1-8
য় উজ্জ্বলতার কবি জীবনানন্দ	বাসন্তী ভট্টাচার্য	9-16
ng Midas, Capitalism, and e "Renaissance of Wonder"	Supriya Dhar	17-20
ীবাদ ও রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য কাব্য	ডঃ মমতাজ বেগম	21-28
ANE AUSTEN : LIFE IN SECLUSION	Soma Mondal	29-31
রণ্যের অধিকার স্তুবাদী ঐতিহাসিক রাজনৈতিক তিবেদনধর্মী উপন্যাস	উত্তম পুরকাইত	32-36
PLAY SCHOOLS AND LANGUAGE PLAY : THE ROLE OF RHYMES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION	Amita Ray	37-40

Social Science :

ধর্ম, সত্য ও নৈতিকতা - ভারতীয় কৃষ্টি ও মননে	ডঃ অদিতি ভট্টাচার্য	41-48
পণ্যভোগবাদ	ডঃ সুজয় ঘোষ	49-62
'সেকেলে কথা'-য় সেকালে কথা ঃ প্রসঙ্গ নিস্তারিনী	ডঃ জয়শ্রী সরকার	63-69

The Nationalist Imageries and the Invocations of the 'Medieval' in Films from Maharashtra during 1920s'[1]	Dr. Urvi Mukhopadhyay	70
Science :		
Biotechnology and Society in the Twenty-first Century	Dr. Debasish Pal	86-
Some Selected Heterocyclic Compounds	বীরেশ্বর মুখার্জী	91-
Wandering in the World of Particles	Dr. Lina Paria	95-
Hazards of the Silicon Fibre	Dr. Ratna Bandyopadhyay	99-1
Enchanted Islands - An Environmental Profile	Dr. Supatra Sen	103-1
Commerce :		
Special Economic Zones – Issues and Challange	– Dipak Kumar Nath	108-1

Editorial

This is the third issue of our Journal. The earlier two issues have won the appreciation of friends and readers in various academic circles. In fact, the feedback was quite stimulating and encouraging for us to go on with the compilation of this third issue. So, here is the automnal harvest gathered from the teacher of different departments. As before, they have done their bit to share with us something of the fruits of their study or research they are doing in their own fields. In future, we have plans to rope in a few scholars from other institutions to enrich this confluence of minds. With little more endeavour and patronage we may hope to do so.

Meanwhile, we would like to have your suggestions and constructive criticisms and also whatever help you can provide. "I do not hope to be correct, but I hope to make progress", as Lord' Maynard Keyness put it.

Section - I

Language and Literature

বাংলা লৌকিক ছড়ায় পশুপাখী (২)

চন্দনা সামন্ত
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

প্রকৃতিতে নানা ধরনের পাখী আছে। তাদের যেমন বিচিত্র বাহারি রঙ, তেমনি গলার স্বরও বিচিত্র। প্রকৃতির কোলে বিরচণ করে প্রকৃতিকে সৌন্দর্যময় করে তোলে। ছড়াকাররা এদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। ছড়ার পরতে পরতে তারই আভাস পাওয়া যায়। আর শিশুমন ছড়ার উড়ন্ত দুরন্ত পাখীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। ছড়ায় পশুর তুলনায় পাখীর নাম যে বেশী পাওয়া যায় এমন নয়। তবে পাখীর 'জাতি গত বৈচিত্র্য'-এর কথা বেশী বলা হয়েছে। চেনা-অচেনা সব পাখীর কথাই কমবেশী ছড়ায় স্থান পেয়েছে। শিশুর প্রথম পাঠ ছড়া। তাই ছড়ায় বর্ণিত পশু-পাখী শিশুমনে সহজেই জায়গা করে নেয়। ছড়ার মতো পুরাতন আর কিছুই হয় না। আবার একইসঙ্গে ছড়া চিরনবীন। শিশু এবং ছড়া ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ছড়া সাধারণত শিশুদের জন্য রচিত হলেও বড়দের উপযোগী ছড়ার ও অভাব নেই। তবে আমার আলোচ্য বিষয় শিশুদের জন্য রচিত যে সমস্ত লৌকিক ছড়ায় পশু-পাখীদের উল্লেখ আছে তারই অন্বেষণ করা। ছড়ার জগৎ এমনই এক অদ্ভুত জগৎ যেখানকার নিয়ম যেন সম্ভব-অসম্ভব সব নিয়মের বাইরের অচেনা এক জগৎ। সেই জগতে উড়ে বেড়ায় চেনা-অচেনা বহু পাখী। ছোট্ট শিশুটিকে প্রকৃতিপাঠে তালিম দেয় ছড়ার ছবি। কল্পনায় সে উড়ে যায় পাখীর ডানায় ভর করে। পাখী কল্পনা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় শিশুর মনে।

বাংলার ছড়াগুলি কোনো বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলার এক প্রান্তে রচিত হলেও অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই একই ছড়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত একটি ছড়া হলো নিম্নরূপ ঃ

তালগাছেতে হুতুমথুমো কাল আছে পাঁদারু।
মেঘ ডাকছে বলে বুক করছে গুরু গুরু।।
তোমাদের কিসের আনাগোনা।
উড়ে মেড়ার বাপ আস্‌চে দিদিন্ ধিনা ধিনা।

বর্ধমান থেকে সংগৃহীত ছড়াটিতে দেখা যাচ্ছে 'হুতুম থুমোর' পরিবর্তে 'হুটটুমাটুম' পাখীর কথা। ছড়াটি হলো –

তালগাছেতে হুটটুমাটুম হুলো পাঁদারু।
চোতমাসের গরমিতে মলো মাগরু।।
তোমাদের কিসের আনাগোনা।
কুঞ্জলতার বাপ এসেছে তাক্ ধিনা ধিনা ধিনা।

আবার যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংগৃহীত ছড়ায় পাওয়া যাচ্ছে এইরকম -

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্।

এই 'হুতুম থুমো', 'হুটুমাটুম্', 'হাট্টিমা টিম্‌টিম্' বাস্তবের পাখী না কল্পলোকের পাখী সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে কেউ কেউ হুতোম পেঁচাকেই এই সমস্ত নামে অভিহিত করেছেন বলে মনে করেন। আসলে ছড়াকারদের সৃষ্টিতে কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে নতুন নতুন পাখীর রূপ ফুটে উঠেছে।

টিয়াপাখীর সৌন্দর্যে ছড়াকাররা যেমন মুগ্ধ তেমনি শিশুরাও। তাই টিয়াকে অবলম্বন করে বহু ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। টিয়াকে নিয়ে বহু পরিচিত ছড়াটি হলো নিম্নরূপ —

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে — — রবীন্দ্র সংগৃহীত

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ছড়াটির মধ্যে দিয়ে কোন তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশিত হয় নি। শিশুর মনে ছন্দের মধ্যে দিয়ে কতকগুলি পশু-পাখীর অসংলগ্ন আচার-আচরণের ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

কোন কোন ছড়াতে টিয়াপাখীকে তোতাপাখী নামে অভিহিত করা হয়েছে —

আতাগাছে তোতাপাখী
ডালিম গাছে মউ
কথা কও না কেন বউ?
কথা কব কী ছলে,
কথা কইতে গা জ্বলে। — রবীন্দ্র সংগৃহীত

এখানে পাখীর বিস্তারিত কোনো বর্ণনা নেই। 'আতার সঙ্গে' মিলের জন্যই যেন 'তোতা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় শালিক নামে পরিচিত যে পাখী তাকেই ইংরেজীতে ময়না বলে। শালিক অনেক রকমের আছে। তবে আমাদের বাড়ীর চারপাশে যে শালিক পাখি ঘুরে বেড়ায় তাকেই ময়না বলে। ময়না নামের মধ্যে মাধুর্য আছে। এই ময়নাকে নিয়ে প্রচুর ছড়া আছে। এছাড়া পাহাড়ী ময়না বা সিঙ্গাপুরী ময়না আছে। খুব সম্ভবত তাদের কথা ছড়ায় তেমনভাবে স্থান পায় নি। অতিপরিচিত শালিকই শব্দমাধুর্যের জন্য

ময়নারূপে ছড়ায় স্থান পেয়েছে।

খুকুর খুকুর ময়না
ভাত খাবি ত আয় না। — ২৪ পরগনা

কিংবা - উতর থেকে এল ময়না
পাখ নাড়ি নাড়ি।
কুল গাছে বসে ময়না
করে চতুরালি।

সরাসরি শালিককে নিয়েও ছড়া রচিত হয়েছে। শালিকের অনেকরকম বিভাজনের মধ্যে আছে গাঙ্-শালিক, গো-শালিক, রামশালিক ইত্যাদি। রামশালিককে নিয়ে একটি ছড়া হল —

রামশালিক রামশালিক পায়ে দিয়ে মোজা
তেলের ভাঁড়ে চান করে ফিঙে হল রাজা।
বনজাত খায় মাছ মোচড়ায় দাড়ি।
উচিত কথা বলতে গেলে দেয় ঝাটার বাড়ি।

রামশালিক সম্পর্কে ছড়ায় যা বর্ণিত হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে তেমন মিল নেই। তেলের ভাঁড়ে ফিঙের চানের কারণটিও স্পষ্ট নয়। বাস্তব অবাস্তবের পার্থক্য তেমন সুস্পষ্ট নয় ছড়ায়।

শালিক সম্পর্কিত আর একটি ছড়া হল নিম্নরূপ —

সাইর নাচে শালিক নাচে মাদার পুষ্প খাইয়া
দুধের ছাওয়াল নাচে মায়ের কোল পাইয়া। — ২৪ পরগনা

সাইর বা সারি ও শালিক সমগোত্রীয় পাখি। তবে এদের মাদারফুল খাওয়ার কথা অজ্ঞাত ছিল।

বাংলাদেশে 'চেতার বৌ' নামে একটি পাখীর কথা পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে যার নাম 'বৌ কথা কও'। চেতার বৌকে কেন্দ্র করে ছড়াটি হল —

চেতার বৌ গো
টাকা দে গো
কাঁঠাল পাকে
লোকে দেখে। — মৈমন সিং

'চেতার বৌ' এখানে পাখী না ব্যক্তি বিশেষের বৌ তা পরিস্কার নয়। টাকা দেওয়া বা কাঁঠাল পাকাব সঙ্গে 'চেতার বৌ' পাখীর কি সম্পর্ক স্পষ্ট নয় ছড়ায়।

'হীরা মন' নামে একটি পাখীর সন্ধান পাওয়া গেছে ছড়ায়। ছড়াটি হলো এইরকম -

সাধ করি পালিলুম পাখী নামে হীরামন
পিঁজরাত থাকি রে পাখী ডাকে ঘন ঘন।। — চট্টগ্রাম

'হীরামন' কল্পলোকের না বাস্তবের পাখী তার প্রমান আজ নেই। তবে যেভাবে সভ্যত অগ্রগতির সঙ্গে পাখী লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাতে কিছুদিনের মধ্যেই অধিকাংশ পা কল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

এইরকম আর একটি স্বপ্নরাজ্যের পাখীর সন্ধান পাওয়া যায় ছড়ায়। পাখীটির ন লটকুনা। যার উপর শিশুকে ঘুম পাড়ানোর ভার দেওয়া যেতে পারে নিশ্চিন্তে —

আয়রে পাখি লটকুনা
ভেজে দেব তোরে বব বটনা।
খাবি আর কলকাটি
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি। — রবীন্দ্র সংগৃহীত

কুর্গাল নামে একটি পাখীর পরিচয় আছে ছড়ায়। এটি মৎস্যখাদক, বিলের ধারে ব করে।

খাল কুলে লাগাইলাম কচু
কুর্গালে কৈল বাসা,
অজাতির সঙ্গে সম্বন্ধ করি
গায়ে সে সহিল কথা। — চট্টগ্রাম

যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংগৃহীত একটি ছড়ায় কোড়াল-কোড়ালী পাখীর উল্লেখ আ খুব সম্ভবত কুর্গালেরই পরিবর্তিত রূপ এটি। ছড়াটি নিম্নরূপ —

কোড়াল বলে কোড়ালী এবার বড় বান
উঁচুকরে বাঁধো ভিটে খুঁটে খাবে ধান।
ধান খাবো না পান খাবো না খাব সরের নাড়ু
দুই হাত ভরিয়ে দেবো সুবর্ণের খাড়ু।

এখানে ছড়ার মধ্যে দিয়ে জীবনের চরম সত্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ছড়াকারে বাস্তবের মানুষ। তাই কঠিন বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারে নি। তার প্রমানও ছড় রয়েছে।

অনেক ছড়াতে 'লেজঝোলা' পাখীর কথা পাওয়া যায় 'লেজঝোলা' নাম থে বোঝা যায় এই পাখীর লেজ বা গুচ্ছ দীর্ঘ বা ঝুলে থাকে। টিয়াপাখী ও ফিঙে পাখী দীর্ঘ লেজ আছে। গ্রামাঞ্চলে 'হাঁড়িচাচা' বলে যে পাখীটিকে দেখা যায় তার লেজও দ এবং অনেক জায়গায় এর নাম 'লেজঝোলা'। একে 'কুটুম্ব পাখী'ও বলা হয়। প্রচলি

রণা এই পাখীর আগমন ঘটলে বাড়ীতে কুটুম্বেরও আগমন ঘটে। মনে হয় এই অতি রিচিত পাখীকেই ছড়ায় আহ্বান করা হয়েছে। ছড়াটি হলো এইরূপ —

আয়রে পাখী লেজঝোলা
খোকাকে নিয়ে কর খেলা
খাবি দাবি কলকলাবি
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি।

ঙে পরিচিত পাখী হলেও খুব বেশী দেখা যায় না। এই ফিঙে পাখীর বাসার সন্ধান রা হয়েছে ছড়ায়। কারণ খোকাবাবুর বিয়ের খবর পৌঁছে দিতে হবে তার বাসায়। ই তার ঠিকানাটির বড়ো প্রয়োজন।

ফিঙ্ ফিঙেটি বাবুইহাটি কোনখানে তোর বাসা।
আমার যাদুর বিয়ে হবে বৌটি হবে খাসা। — পাবনা

ড়ায় পাখীর মধ্যে ঘুঘুর একটি বিশেষ স্থান আছে। তাই ঘুঘুকে নিয়ে প্রচুর ছড়া আছে। ঘুকে নিয়ে যেমন প্রবাদ আছে তেমনি ঘুঘুকে নিয়ে Taboo আছে। 'ভিটেয় ঘুঘু চড়ানো' বাদটির মধ্যে দিয়ে বংশ নাশের বিশ্বাস আছে। অন্যদিকে ছড়ায় ঘুঘুর বিয়ে দিয়ে সেই রাকে মুছে দেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ছড়াটি হলো —

ঘুঘু মলো চাল পিটুনি খেয়ে,
আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে।। — বর্ধমান

বীন্দ্র সংগৃহীত 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে' — ছড়াটির পাঠান্তরে পাওয়া ায় 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল ঘুঘুর বিয়ে'। এখানে পাখি এবং মানুষ মিলেমিশে একাকার য়ে গেছে। পরিবেশবিদরা মনে করেন ঘুঘুপাখী সংরক্ষণের মানসিকতা থেকেই এই রণের ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘুঘু পাখির মাংস খুব সুস্বাদু, সুতরাং নির্বিচারে ঘুঘু নিধন রিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। খুব সম্ভবত এই জন্যই ঘুঘুকে সন্তানরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে Taboo তে।

ঘুঘুর প্রায় সমগোত্রীয় পাখী পায়রা। পায়রার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে খোকনকে। খোকন ও পায়রা যেন অভিন্ন —

খকন ধকল পায়রাটি কোন বিলেতে চরে
খকন বলে ডাকলে পরে মায়ের কোলে পরে। — বাঁকুড়া

এছাড়া পায়রাকে অবলম্বন করে লেখা বহুল প্রচলিত ছড়াটি হল —

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে

বড় সাহেবের বিবিগুলো নাইতে নেমেছে
দুই পারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে। — রবীন্দ্র সংগৃহীত

চঞ্চলা নাম্নী পাখীর উল্লেখ পাওয়া যায় ছড়াতে। বাস্তবে এই পাখির সন্ধান পাওয় না। তবে খঞ্জনা পাখীর স্বভাব চঞ্চলা বলে তার স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য চঞ্চলা নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। জীবনানন্দের কবিতায় খঞ্জনা পাখীর ব্য লক্ষ্য করা যায়।

ছড়াটি হল নিম্নরূপ —

আয়রে পাখী চঞ্চলা
খেতে দেব দুধ কলা
আসবি যাবি খেল খেলাবি
খোকাকে নিয়ে খেলা করবি। — মেদিনীপুর

কুৎসিত, বিশ্রী দেখতে হলেও কাক ছড়া থেকে বাদ যায় নি। কাককে ছড়ায় খোব প্রতিপক্ষ করা হয়েছে —

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি
খোকন গেছে কার বাড়ি ?
আয়রে খোকন ঘরে আয়
দুধ মাখা ভাত কাকে খায়। — বর্ধমান

কিংবা কা-কা-কা কাকের ছানা

ভাত খায়না খোকন সোনা
কাগা বগা আয় আয়
দেখযে খোকা ভাত খায়। — বীরভূম

খোকার চোখে সবকিছু সুন্দর। তাই বাড়ীর চারপাশে অহরহ ঘুরে বেড়ায় যে পা তাকে বড়রা কুৎসিত ভাবলেও খোকা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। ডাগর চোখে কাকের দিকে তাকিয়েই ভাত-খাওয়া সাঙ্গ করে। অবশ্য নবান্ন উৎ কাক আমন্ত্রিত হয়, ছড়াতে তার প্রমান আছে —

কো কো কো, আমাগো বাড়ী শুভ নবান্ন
শুভ নবান্ন খাবা
কাক বলি লবা

- নবান্নের ছড়া — বরি

অবশ্য গ্রামাঞ্চলে যে নবান্নের উৎসব হয় তাতে পশু-পাখী সবারই নিমন্ত্রণ থাকে।

ভাঙে যাদের ডাকে অহরহ যাদের সান্নিধ্য পায় গ্রাম বাংলার মানুষ, তারাও কাছের হয়ে ওঠে। এই অনুভূতিই বড় হয়ে ওঠে ছড়ায়।

বাদুড় চামচিকা স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখীর মধ্যে পড়ে না। যেহেতু এদের ডানা আছে তাই ছড়াকাররা এদেরকেও পাখীর মধ্যে গনা করে ছড়ায় স্থান দিয়েছে।

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে,
টোপর মাথায় দে।
তোরা দেখতে যাবি কে?
চামচিকেতে বাজনা বাজায় খ্যাংরো কাঠি দে। ২৪ পরগনা

বাদুড় টোপড় মাথায় দিয়ে বরবেশে হাজির হয়েছে এখানে। তার বিয়েতে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন চামচিকে। এইরকম উদ্ভট কল্পনা শিশুমনে আনন্দের দোলা দেয়।

ছড়াকারদের দৃষ্টি থেকে হাঁস, বক ও বাদ যায়নি। বকের সঙ্গে শিশুর মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই শিশুর মুখে শোনা যায় —

বক মামা বক মামা ফুল দিয়ে যা।
নারকোল গাছে কড়ি আছে গুনে নিয়ে যা। বর্ধমান

হাঁস গৃহপালিত। তার প্রতি স্বাভাবিক মায়া মমতা থাকে। সেও বাড়ীর সদস্য হয়ে ওঠে। তাই তার সম্পর্কে সাবধানতার অভাব নেই।

আয়রে আমার সাধের হাঁস — তই তই তই
হল্‌দি খি না বাট্যা থুইছি তোরা রইলি কই ?
সকাল সকাল বাড়ীতে আয়,
ঘাটের পথে হিয়াল চায়।
কুড়াল পক্ষী চাহিয়া রইছে ধইরা লইয়া যা,
আয়রে আমার সাধের হাঁস সকাল সকাল আয়। — ঢাকা

ছড়া প্রায়শই বস্তু প্রাণের উপর ভিত্তি করে রচনা হয় না। সুরের ও ছন্দের দিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। একটি প্রচলিত ছড়া হল —

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে। — বাঁকুড়া

পক্ষীবিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী বুলবুলি শস্য খাদক নয়। এদের ঠোঁটের গঠনই এমন যে তারা শস্যের দানা খেতে পারে না বা গিলে খেতে পারে না। সুতরাং বাংলার ছড়াকাররা বুলবুলি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ব্যতীতই ছড়াটি রচনা করেছিলেন। অবশ্য

চট্টগ্রাম ও ২৪ পরগনা থেকে প্রাপ্ত এই রকম ছড়াতেই বুবুলির পরিবর্তে টিয়াপ
এবং চড়াই পাখীর উল্লেখ পাওয়া গেছে।

বাংলার লোককথায় টুনটুনির উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়। কিন্তু ছড়ায় টুনটুনি
ব্যবহার তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। তবে উপকথার মধ্যেও ছড়া শুনতে পাও
যায়। উপেন্দ্রকিশোর সংগৃহীত লোককথায় 'টুনটুনি ও রাজার কথা' গল্পটির উল্লেখ
করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেখানে টুনটুনিকে নিয়ে অনেক ছড়া আ
যেমন রাজার সমকক্ষ ভেবে টুনটুনি বলেছে —

রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরে সে ধন আছে !

আবার রাজার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছে —

রাজা বড়ো ধনে কাতর
টুনির ধন নিল বাড়ীর ভিতর।

এই গল্পগুলির রূপকধর্মী। টুনটুনি দুর্বল শ্রেণীর প্রতিনিধি। তবুও শিশুর কাছে
গল্পগুলির ছড়ার টুনটুনিই তাদের কাছে বেশী আকর্ষণীয়।

বাংলা লৌকিক ছড়ার পরতে পরতে রয়েছে পশু পাখী। ছড়াগুলি যেন পশুপা
চিত্রশালা। পশুপাখী, গাছপালা, ফুল-ফল, নদী-জল সব কিছু নিয়েই আমাদের পরিবে
এই পরিবেশেই আছে জীবনের শিকড়। আর লোকসাহিত্য এই শিকড়কে কেন্দ্র ক
গড়ে ওঠে। লোক সমাজ ও শিকড় বিচ্যুত হতে চায়নি কখনো। না বাস্তবে,
কল্পনায়। তাই লোক সমাজ থেকে সৃষ্ট লোক সাহিত্যে আছে প্রকৃতি মায়ের স্নেহা
স্পর্শ। এখান থেকে শিশুর প্রথম পাঠ শুরু হয়। যা পরবর্ত্তী জীবনকে নিয়ে য
পূর্ণতার দিকে। ছাড়াকাররা ছিলেন পরিবেশ সচেতন। ছড়ায় ছড়িয়ে আছে তার প্রমা
পশু পাখী প্রকৃতিরই শুধু অঙ্গ নয়। মানব জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এ
প্রয়োজন, এরাও মানবের আত্মীয় এই বোধের প্রথম পাঠ এই ছড়ার মধ্যেই হয়েছে

ঋণ স্বীকার —

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলার লোক সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — লোক সাহিত্য, বিশ্বভারতী
৩। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী — টুনটুনির বই
৪। নির্মলেন্দু ভৌমিক — বাংলা ছড়ার ভূমিকা
৫। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ — জ্ঞান ও বিজ্ঞান, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা।
৬। অনাথ নাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্র
ঠাকুর সংগৃহীত — ছেলেভুলানো ছড়া।

বিষন্ন উজ্জ্বলতার কবি জীবনানন্দ

বাসন্তী ভট্টাচার্য
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বাংলা সাহিত্যে উত্তর আধুনিক কবিতার পদসঞ্চার শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রভাবনার বিরোধিতা করে। রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা ছিল জীবনসম্পর্কিত বলিষ্ঠ বিশ্বাস ও ঈশ্বরীয় ধ্রুবতারায় সুস্থিত। রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছিলেন ঠাকুরবাড়ীর বিশিষ্ট আভিজাত্যে, ব্রাহ্ম পরিবারের ঔপনিষদিক ভাবনার পরিমন্ডলে। তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল এমন এক গভীর আস্তিক্যবোধ যা শুধুই ঈশ্বরকেন্দ্রিক নয়, যে বিশ্বাসের কেন্দ্রে মানুষও বিরাজ করে। তাই জীবনের উপান্তে এসে রাজনৈতিক, সামাজিক নানা অবক্ষয়ের অভিজ্ঞতার পরেও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। এই প্রত্যয়ের আলোকেই আলোকিত ছিল তাঁর ভুবন। সে ভুবনে স্রষ্টা থেকে সৃষ্টি — এ পৃথিবীর তাবৎ অণু-পরমানুই হল সুন্দর ও আনন্দময়।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ ভাবনা যে সর্বদাই সমর্থন পেয়েছে তা নয়। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর পুরাণচারী হিন্দুধর্মের যে পুনরুত্থান ঘটেছিল তার প্রবক্তারা রবীন্দ্রসাহিত্যের সমর্থক ছিলেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ। আসলে রবীন্দ্ররচনা এমন এক প্রাজ্ঞ মানসিক অনুশীলনের প্রকাশ যে নির্দিষ্ট কোন মতবাদের ধ্বজা বহন করলে তার পূর্ণ রস গ্রহণ অসম্ভব। উক্ত ব্যক্তিসমূহ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুসমাজ সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব পোষন করতেন এবং এই মনোভাবই ছিল এঁদের রবীন্দ্রবিরোধিতার ভিত্তি।

আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রবিরোধিতায় সামিল হয়েছিলেন কারণ রবীন্দ্রনাথের মত ও আদর্শ ছিল ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উৎসাহী নেতা ছিলেন কিন্তু রক্তাক্ত সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন না। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে আসা ও শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় তথা মানুষ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা সকলে বোঝে নি এবং সমর্থন করেনি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিকে বললেন অস্পষ্ট, 'চিত্রাঙ্গদা'কে বললেন দুর্নীতিপূর্ণ অশ্লীল।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও রবীন্দ্রবিরোধিতা ছিল। কিন্তু লক্ষ্যনীয় এই বিরোধিতা থেকে নতুন কিছুর জন্ম হয়নি। কারণ এই বিরোধিতা অনেকাংশেই ছিল ব্যক্তিনির্ভর। বরং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে কিছু নবীন কবিসাহিত্যিকের বিরোধিতা জন্ম দিল এক নতুন রবীন্দ্রবিরোধিতার — যে বিরোধিতার ভিত্তিই হল রবীন্দ্র কাব্য-আদর্শ। তাই সম্ভব হল রবীন্দ্রকাব্য ভাবনার জগৎ থেকে সরে এসে নতুন এক কাব্যভাবনার জগৎ সৃষ্টি

করা, যাকে চিহ্নিত করা হয় উত্তর আধুনিক যুগের কাব্য অভিধায়।

যথার্থ সাহিত্যে পুনরাবর্তন মৃত্যুরই নামান্তর। সেখানে চাই নূতনের আবাহন তথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। তাই 'পুনশ্চ'-র কবিতায় স্বয়ং রবীন্দ্রন ভাষা ও ছন্দের ফর্মকে ভেঙ্গে কবিতায় এনেছিলেন নতুন পরীক্ষার স্বাদ। তাতে কবি রূপবদল হয়তো কিছু পরিমানে হয়েছিল কিন্তু নবীন কবি সাহিত্যিকদের মন ভরে তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথের প্রেম, রোমান্স ও অধ্যাত্মবাদের অ থেকে সরিয়ে এনে বাস্তবতর পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজ নানা কারণেই অস্থির ছিল। মানুষের মনোজীবনে এবং ভাবজীবনে পুরনো মূল্যা ও বিশ্বাসের স্থিতি নষ্ট হয়েছিল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের কার স্বভাবতই বিংশ শতকের বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবিমানস পুরনো মূল্যবোধ থেকে চ্যুত অন্বেষণ করছিল নতুন আশ্রয়ের। সমাজে উত্থিত নানা প্রশ্ন সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্র করে সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠুক এই ছিল নবযুগের নবীন সাহিত্যকারদের দাবি। দেখি একালের বিদগ্ধ কবিমানসের অন্বেষণ ছিল বিচিত্র আঙ্গিকে। বিষ্ণু দে ছি মার্কসীয় দর্শনে অনুরক্ত। তাঁর 'উর্বশী ও আর্টেমিস', 'নাম রেখেছি কোমল গা প্রভৃতি উল্লেখ্য। সমর সেনের প্রধান অবলম্বন গদ্যকবিতা। রোম্যান্টিক ভাবলু একেবারে পরিত্যাগ করে সমাজের দুঃখলাঞ্ছনাকে তির্যক বাঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছি তাঁর 'তিনপুরুষ', 'কয়েকটি কবিতা' প্রভৃতি রচনায়। সুধীন্দ্রনাথের কবিমনে নিখিলনাস্তি। বর্তমান জীবনের নিঃসঙ্গতা, ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গতা তাঁকে বা করেছিল। 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী', প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর এই ব্যাকুলতা এমন শব্দকোষতৈরী করেছিল যা হয়ে উঠেছিল অতীব দুরূহ। নতুন জীবনের আবেগ ও থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেননি বা হয়তো চানও নি। বরং বুদ্ধির সূচী মুখকে শ করে তুলেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া', 'মাটির দেওয়াল', 'পারাপার' প্র কাব্যগ্রন্থে তাঁর পরিশীলিত মনটিকে চিনে নেওয়া যায়। তাঁর কাব্যে তিনি সাম্প্র বাক্‌রীতিকে গ্রহণ করলেও প্রেম, সৌন্দর্য, রোমান্টিকতা, প্রভৃতি প্রসঙ্গে তিনি পুরাতনপন্থী ছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিনে নেওয়া যায় কবি সুধীন্দ্রনাথের অনি দ্বন্দ্বজর্জর কবিমানসটিকে। বুদ্ধদেব বসুর অন্বেষণ ছিল অনুভূতি, প্রেম ও চৈত জগতে। 'প্রগতি'কে কেন্দ্র করে তিনিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রভাবাদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি 'বন্দীর বন্দনা', 'পৃথিবীর প্রতি', 'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছিল। সমাজনীতি ও সংস্কারের প্রবল বিরূদ্ধতায় তাঁর ফুটে উঠেছিল বাংলা কাব্যের পালাবদলের ইঙ্গিত। এই পালাবদলের দিশারী হয়ে উ 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', প্রভৃতি পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে উঠেছিল এক বিরাট কবিগোষ্ঠী যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে দিতে চেয়েছিলেন এক

আইডেনটিটি। এই কবিগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই এই নতুন আইডেনটিটি। এই কবিগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই এই নতুন আইডেনটিটি খোঁজার পথে তাঁদের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছিলেন বাস্তব মানুষ ও মানুষের বাস্তব সমস্যাকে। ব্যতিক্রম জীবনানন্দ দাস। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি তন্ময়তা থেকে নবীন কবির দল ক্রমশই দূরে সরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দের কাছে তাঁর কবিসত্তার প্রধান অবলম্বন ছিল নিসর্গ প্রকৃতি। এদিক থেকে দেখলে এই ধারার কবিদের মধ্যে জীবনানন্দই হলেন বিশিষ্ট। কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর কথায় —

'সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে, প্রকৃতির কবি বলা যায়, তিনি জীবনানন্দ।'

তবে রবীন্দ্রকাব্যের প্রকৃতি আর জীবনানন্দের প্রকৃতির মধ্যে আছে মেরুপ্রধান পার্থক্য। রবীন্দ্রকাব্যের প্রকৃতি সংস্কৃত কবিদের প্রভাবজাত। সে প্রকৃতি জড় নয় চেতন; শুধু চেতনও নয় তা যেন ঈশ্বরের আনন্দের প্রকাশক। গাছের পাতায় যে আলোর নাচন ঝিকিয়ে ওঠে তাও যেন অনন্তবহতা আনন্দেরই উদ্ভাস। রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দমন্ডিত ভাবনার মূলে ছিল ঔপনিষদিক শান্তি ও সৌন্দর্যমন্ডিত ব্রহ্মজ্ঞান। এই ভাবনার জগৎ থেকে বহুদূরে ছিল জীবনানন্দের অবস্থান। জটিল পৃথিবীর দুর্বোধ্য নাস্তিকতায় আক্রান্ত ছিল জীবনানন্দের মানসজগৎ। কোনো পরম চৈতন্যের কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা কাব্যগতভাবে আশ্রয় খোঁজেননি। তাই বুঝি এক ধরনের আত্মিক বিপন্নতা থেকে তিনি কখনই মুক্তি পাননি। জীবনস্রোতে দুঃখের অনিবার্যতাকে স্বীকার করেই রবীন্দ্রনাথ বলেনঃ

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু অনন্ত, তবু আনন্দ জাগে।'

কিন্তু জীবনানন্দ কোনো কিছুকে চরম মনে করে সুস্থিরতা লাভ করার মধ্যে কোনো আত্মতৃপ্তি পান নি। তাই জীবনানন্দের অনুভব ঃ

'কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙ্গে — ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো;' (১)

কবির মন যেন এই ভেবেই বেদনার্ত যে এই পৃথিবীতে সুন্দর আছে, সৌন্দর্যও আছে কিন্তু সবই যেন বড় দ্রুত অপসৃয়মান। তাই তাঁর অনুভবে এ পৃথিবীর সুখ আনন্দ জীবন সবই খন্ডিত রূপেই ধরা পড়ে। শুধু খন্ডিত নয়, কবি যেন স্বল্পস্থ, সজাগ। চিল যেমন আচমকাই মেঠো ইঁদুরকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়, জীবনকেও তেমনি মৃত্যু তার অতর্কিত হানায় তেমনই নির্মমতায় কেড়ে নিয়ে চলে যাবে এই পৃথিবী থেকে। মৃত্যুত্তীর্ণ অসীমে

কোথাও অমরত্বের আশ্বাস নেই।

মৃত্যু যেখানে অপেক্ষমান, ভবিতব্য যেখানে নির্মম কবি সেখানেই আশ্রয় খোঁ
তাঁর বাংলার প্রকৃতির কাছে। বিপন্ন অস্তিত্ব আঁকড়ে ধরতে চায় এ জীবনের আপাত
উপকরণগুলোকে। মন বিশ্বাস করতে চায় :

'..... কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে।' (২)

— তারই নাম বুঝি ভালোবাসা। কিন্তু এতো রবীন্দ্রনাথের সুস্থিত, প্রাজ্ঞ জীবনদর্শন
যা নাস্তিতেও অস্তির বিশ্বাস অটুট রাখবে। জীবনানন্দ যে 'নেই'-এর সময়ের ব
মন্বন্তর-উত্তর জীবনে অন্ন নেই, ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনে নিরাপদ আশ্রয় নেই, দাঙ্গাবিধ
জীবনে নেই পারস্পরিক বিশ্বাস, নেই উষ্ণ মানবিকবোধ। তাই রবীন্দ্রনাথ
জীবনানন্দের সাদৃশ্য অধিকতর 'ওয়েস্টল্যান্ডে'র কবির সঙ্গে। জীবনের পতিত জমি
ধ্বংস এত প্রকট যে জীবনের স্পন্দনকে খুঁজে নিতে হয়। আর তাই এ জীবন এত
কবির কাছে। মৃত্যু এত বেশি ঘনিষ্ঠ যে সর্বদাই এক বিধুর বিষন্নতা ঘিরে থাকে কবি
এবং কবির রচনাকে। প্রতি ছত্রে তিনি মনে ধরিয়ে দেন মৃত্যু আছে তোমার
পাশটিতেই। আসলে তিনি বলেন জীবনেরই কথা। মৃত্যু অমোঘ বলেই এ জীবন
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের প্রতি কবির এত আকুলতা। এই আকুলতাই পাঠককে সাহ
করে কবিব্যবহৃত দুর্বোধ্য শব্দচয়ন, অপরিচিত উপমাপ্রয়োগের অন্তরালে যথ
অনুভবটিকে চিনে নিতে। আপাত বিষন্নতার আড়ালে জীবনের উত্তাপ টের পাও
যায়। এই জীবনকে কবি খুঁজে পান এই পৃথিবীরই বুকে।

'সে এসেছে, — আকাশের শেষ আলো পশ্চিমের মেঘে
সন্ধ্যার গহ্বর খুঁজে পালায়েছে! রক্তে রক্তে লাল
হয়ে গেছে বুক তার, — আহত চিতার মত বেগে
পালায়ে গিয়েছে রোদ, — সরে গেছে আলোর বৈকাল। (৩)

লক্ষণীয়, কবি জীবনে আলোর সন্ধান পান। কিন্তু পদ্মপত্রে নীরের মত তা তাঁর কা
স্থায়ী হয় না। জীবনের আবাহনে আর বিসর্জনে যেন এক লহমার ব্যবধান। ত
জীবনানন্দ মানেই এক আধারে নির্মান ও ধ্বংসের পরিবেশনা।

লোকভীরু জীবনানন্দ সর্বদাই এক আপনভোলা, উদাসীন থানিক বা বিম
নির্জনতায় বাস করতেন। তাই তাঁর অন্তরব্যাকুলতার ইতিবাচক কথাও প্রকাশ পা
'হেমন্তের পাতা ঝরার সুরে'। আসলে নাগরিক জীবনের নিয়মকানুনে কবি কখনই স্বা

বোধ করতেন না। কলেজে কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা, দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবেশীদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কবিকে সত্যই আহত করেছিল। তাই দেখি তাঁর কবিতায় নৈরাশ্য পীড়িত এক যুবকের জীবনে সুন্দরী স্ত্রীও আছে, ফুটফুটে সন্তানও আছে। তবু সে শুয়ে থাকে লাশকাটা ঘরে। অর্থাৎ সব থেকেও শহুরে জীবনের উদ্বেগ, জটিলতা সর্বোপরি যান্ত্রিকতা মানুষকে ক্লান্ত-ক্লান্ত করে।

কবির শান্তি প্রাপ্তির শেষতম ঠিকানা এই বাংলার প্রকৃতি। 'রূপসী বাংলা' বা 'বনলতা সেন'-এ তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আশাবাদ ও স্বপ্নময়তা। গ্রামবাংলার সৌন্দর্যে লীন জীবনানন্দের কবিসত্তা। পল্লী পরিবেশের চিত্র রচনায় তিনি তাই বাঙ্ময়। বাংলার প্রকৃতি তার বিচিত্র রূপ নিয়ে যে ধরা দিয়েছিল তাঁর কাছে তা তাঁর অলঙ্কার সৃজনের বৈচিত্রেই ধরা পড়ে। কবি যখন বলেন, 'আকাশের রং ঘাস ফড়িঙ্গের দেহের মতো কোমল নীল' অথবা, 'সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক জোনাকির দেহ হতে' তখন কবিকে আর 'বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি' বলতে মন চায় না। মন চায় না তাঁর কাব্য-কবিতার ক্যানভাস জুড়ে থাকা মৃত্যুগন্ধী শব্দ চয়নকেই কবির অন্তরসত্য বলে বিশ্বাস করতে। বরং প্রত্যয় জাগে এই বিশ্বাসে যে জীবনের চালচিত্রের মধ্যেই বারবার কবি খুঁজে পেতে চেয়েছেন জীবনের নবীন অভ্যুদয়কে। বিচিত্র প্রতীকের মধ্য দিয়ে, ধ্বনিব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রূপলোকের এমন এক অধরা মাধুরীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন ও পাঠককে দিয়ে গেছেন যা সত্যই শব্দ-বাক্যের অতীত।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'। কবির উচ্চারণ এখানে অনেকটাই ভাবালুতায় ভরা। ছন্দ ও শব্দ বন্ধের নতুনত্বের আঙ্গিক এখানেও দেখা দিয়েছে। 'ঝরাপালকে'-র প্রথম কবিতা 'আকাশলীনা' —

'সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা,
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে।'

নতুন কবির আবেগময়তাই এখানে প্রধান। কবির নিজস্ব সুর ঠিক তেমন স্পষ্ট হয়নি। এই কবিই যখন 'সাতটি তারার তিমির' লিখেছেন তখন তিনি এক পরিণত কবি, যেখানে চিরাচরিতের পুনারবর্তন নেই।

'তবু তার উপচার নিয়ে সেই নারী,
কোথায় গিয়েছে আজ চলে;
এই তো এখানে ছিল সে অনেক দিন;
আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হলে

তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয় ঃ
অনুভব করে আমি অনুভব করেছি সময়।'

বোঝা যায়, অগ্রজদের ধারাবাহিকতা এ কবিকে তৈরী করেছে কিন্তু পুরনো প্রভাব থেকে তিনি কতখানি মুক্ত। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন উত্তর-আধুনিক বাংলা কবিতার মূল নিহিত আছে সমকালের ইংরাজী কবিতার মধ্যে। বাক্‌রীতি ও বিষয়বস্তুতে ভিক্টোরীয় প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে ইংরাজী কবিতায় আধুনিক ধারার সূচনা করেছিলেন হপ্‌কিন্‌স্। যদিও ১৮৮৯ সালে হপকিন্‌স্-এর মৃত্যুতে তাঁর প্রবর্তিত অভিনব কাব্যধারা সম্বন্ধে সমাজ উদাসীন হয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজের সনাতন রীতিনীতির পরিবর্তনের ফলে রবার্ট ব্রিজেস-এর দ্বারা প্রকাশিত হপকিন্‌স্-এর কাব্যগ্রন্থ পাঠকমহলে সমাদর পেল। বস্তুতঃ তখনই সূত্রপাত ঘটল ইংরাজী সাহিত্যের যথার্থ মডার্ন যুগের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই বাংলা সাহিত্যে এসে লেগেছিল এই পরিবর্তনের হাওয়া। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবিসমাজ আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমস্যাজর্জর বাস্তব রূপকে। কাব্যরচনার এই নতুন পথেই শুরু হয়েছিল সেদিনের আধুনিক কবিতার পথচলা। সে পথেরই পথিক আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রতীকপুরুষ জীবনানন্দ দাশ। বিষয় ভাবনায় কবি হয়তো পুরনো প্রথারই হাত ধরেন। অর্থাৎ তাঁর রচনার আলম্বন বিভাব সেই প্রকৃতিই। কিন্তু আধুনিক যুগের কবির হাতে কবিতার আঙ্গিক গেছে বদলে। তাই প্রকৃতির চিরাচরিত প্রচলিত অনুষঙ্গগুলি তিনি গ্রহণ করেন না। বরং দেখি নতুন থেকে নতুনতর উপমার চয়ন ঃ

১। পাখির নীড়ের মত চোখ [৪]

২। শিশিরের শব্দের মত সন্ধ্যা [৫]

৩। কিশোরীর চাল ধোয়া ভিজে হাত [৬]

এমনই অজস্র পংক্তি ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর রচনায়। কবিতার নতুন ভাষা, নতুন আঙ্গিক আমাদের চেনা জগতের মধ্যে সঞ্চারিত করে এক রহস্যময়তা। আমরা না কবিরাও এই রহস্যময়তার ছোঁয়ায় যেন রোম্যান্টিক হয়ে উঠি মনে মনে। জীবনানন্দের অলঙ্কার রচনার কৌশল আমাদের এক ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে 'অফুরন্ত রৌদ্র' ও 'অনন্ত তিমির' 'তারার আলো' ও 'নিরালোক' — এই ধরনের বিরোধাভাসের ব্যবহার পাঠককে যেন বা কিছুটা বিভ্রান্তই করে। পাঠক যেন সহসা বুঝতে পারে না কবিসৃষ্ট জগৎ কি স্বপ্নের জগৎ নাকি স্বপ্নভঙ্গের জগৎ। আসলে কবির নিজেরই যে স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছিল। পৃথিবীর পরিচিত প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব থেকে তাঁকে চোখ ফেরাতে হয়েছিল চারপাশের অরাজক, বিশ্বাসভঙ্গের পৃথিবীতে। '৪৭-এর দাঙ্গা ও দেশভাগ তিনি ভুলতে পারেননি। ভুলতে পারেননি ফেলে আসা বরিশালের স্মৃতি। যে স্মৃতি তাঁকে হয়তো

রক্তাক্ত বেদনাই দিয়েছে। জীবনানন্দ গবেষক ক্লিন্টন বি সীলি যথার্থ বলেছেন, 'আধিভৌতিক চেতনা সাধারণ ভাষার কাঠামোর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। বিশেষ করে রোজকার যুক্তিধর্মী ভাষা ব্যবহারে। এই বিশেষ ধরনের বিরোধাভাস দিয়ে যা অনির্বচনীয় তাকে বলতে হয়।' [৭] এই অনির্বচনীয়তার সন্ধানেই যুগ কাল পেরিয়ে জীবনানন্দের কাছে ছুটে আসা।

জীবনানন্দ সাহিত্যের ইতিহাসে সেই পর্বের কবি যে পর্বে বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্র প্রভাবকে অস্বীকার করে এক নতুন বাঁক নিতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন রবীন্দ্রপ্রভাবকে অস্বীকার করা মানে রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য করা বা অসম্মান করা নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বয়ং জীবনানন্দের মূল্যায়ন এক্ষেত্রে জরুরী — 'আমাদের দেশে সাহিত্যলোকে রবীন্দ্রকাব্যই হয়তো আমাদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। .... যে প্রতিভা, স্বপ্ন, সাহস, নিঃশ্রেয়স বিরাট ঐতিহ্যের স্পন্দন রয়েছে তাঁর সাহিত্যে, তাঁর জীবনে, আমাদের সেই দীপ্তিময় পরিমন্ডলের ভিতর প্রবেশ করবার প্রয়োজন রয়ে গেছে; রবীন্দ্রসাহিত্য পঠিত হোক, আলোচিত হোক, আধুনিক শতাব্দীর এই শেষ, এই নিঃশেষহীন উজ্জ্বলতম মানুষের অমর সান্নিধ্য অনুভব করা হোক — সব সময়ই অনুসন্ধান করা হোক।'[৮]

বোঝাই যাচ্ছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের 'নিঃশেষহীন উজ্জ্বলতা'। জীবনানন্দের কাছে প্রয়োজনীয় সর্বোপরি পাঠ্য বলে মনে হয়েছিল। বিশেষতঃ মন্বন্তর, কালোবাজার, দাঙ্গ বিধ্বস্ত মানবের জন্য। এ যেন এক মহান কবিকে আর এক মহান কবির স্বীকৃতি। কিন্তু স্বয়ং জীবনানন্দ? তিনি তাঁর সমকালেই বিশেষ সমাদর পাননি। তাঁর সমসাময়িক লেখক বন্ধুরা যে সময় যশ, খ্যাতি লাভ করেছেন তখন তাঁকে নিজের অমনোনীত কবিতা নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁরই সহযোগী কোনও কবিসম্পাদকের কাছ থেকে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত অপ্রচলিত শব্দরাজি 'শনিবারের চিঠি'-র পাতায় পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এমনতর অনাদর, উপেক্ষা, বিদ্রূপের মধ্যেও প্রকৃত সমঝদার চিনে নিতে ভুল করেনি আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রতীকপুরুষ জীবনানন্দ দাশকে। 'কল্লোল' পত্রিকায় জীবনানন্দের 'নীলিমা' কবিতাটি পড়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন অনুজ কবি বুদ্ধদেব বসু। কবিতা-পাগল বুদ্ধদেবের মুগ্ধতা এমনই তীব্র ছিল যে জীবনানন্দের শতাধিক কবিতা ছাপা হয়েছিল তাঁর 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকায়। সম্পাদক কবির সেই মুগ্ধতার ধারা আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যখন আজকের পাঠক নতুন করে আবিষ্কার করে গদ্যলেখক জীবনানন্দকে। আসলে নিন্দা, প্রশংসা, বিদ্রূপ কোনকিছুই আত্মমগ্ন জীবনানন্দকে তাঁর ধীর, নিশ্চিত গতির পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মানে এমন এক মৌলিক ভাষাভঙ্গী ব্যবহার করেছেন যা তাঁকে দিয়েছে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের প্রধান কবির স্বীকৃতি। এমনকি উত্তর -আধুনিক বাংলা কবিতা জীবনানন্দীয় রীতিকেই

অনুসরণ করেছে বেশি।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিশিষ্ট সমালোচক শ্রী অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য। 'একাকীত্বের দুর্গম নভশ্চর জীবনানন্দ কাছের মানুষের কাছে পরম বিস্ময়, দূরের মানুষের কাছে আত্মীয়। পরাবাস্তবতা (SURREALISM) ও অস্তিত্ববাদের (EXISTENTIALISM) নিরিখে পন্ডিত-গবেষক জীবনানন্দকে বিশ্লেষণ করতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং কবি কোন 'বাদ' 'নিয়েই' বাদ-প্রতিবাদ করেননি। সমস্ত সত্তা দিয়ে, সমগ্র চেতনা দিয়ে তিনি বিশ্ববোধ ও ব্যক্তিবোধের সমন্বয় খুঁজেছেন, কখনও আত্মার গভীরে হারিয়ে গেছেন, কখনও দূরদেশকালের স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্যে পথ চলেছেন। জীবনানন্দকে তাই চিরপথিক বলে মনে হয়, পথ চলাতেই তাঁর আনন্দ।'

প্রাজ্ঞ সমালোচকের এই মন্তব্য পড়ে মনে হয় প্রকৃত কবি সম্পর্কে এত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কবিকে চিনে নিতে হয় অনুভবে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুর ঠিকই বেজে ওঠে শব্দের অমোঘ উচ্চারণে, সে সুর আনন্দেরই হোক বা বেদনার। আমাদের নাগরিক জীবনের অতিব্যস্ততা যখন আমাদের ক্লান্ত করে, মেকি ভদ্রতা যখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমস্ত প্রাচুর্যের মধ্যেও আমরা কতখানি অন্তঃসারশূন্য, অজস্র লোকের মাঝেও আমরা কতখানি একা তখন মনে হয়- 'এ জীবনের সব লেনদেন' বুঝি ফুরিয়ে গেছে। তখন থাকে শুধু অনুভব, অনুভবী এবং অনন্ত নৈঃশব্দ।।

সূত্রনির্দেশ

(১) রূপসী বাংলা।

(২) ধূসর পাণ্ডুলিপি / নির্জন স্বাক্ষর

(৩) ধূসর পাণ্ডুলিপি / জীবন

(৪) বনলতা সেন

(৫) বনলতা সেন

(৬) রূপসী বাংলা

(৭) 'দেশ' ১৯৯৮ জীবনানন্দ সংখ্যা ২/ প্রবন্ধ 'রৌদ্রের অন্ধকার'-এ দাঁড়িয়ে'

(৮) 'দেশ' ১৯৯৮ জীবনানন্দ সংখ্যা ২/ প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ'

ঋণস্বীকার

(১) জীবনানন্দ দাসের কাব্যগ্রন্থ ১ম ও ২য় খন্ড

(২) হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর / বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

(৩) জীবনানন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল / সুমিতা চক্রবর্তী

King Midas, Capitalism, and the "Renaissance of Wonder"

Supriya Dhar
English Dept.

Capitalism is like King Midas. King Midas had turned into gold everything which he touched. Capitalism is that force which turned, everything into commodity. In this commodity-based society man's sense of isolation from social reality increased, commodity production extended everywhere, the doors of an unknown market became open, and everything was exposed to be bought or sold. The artist in such a social system found himself in a highly peculiar situation because of this fact that artist in such an order became a commodity producer. World of personal patronage was replaced by a free market as a result of which the work of art was flung to the laws of competition. Naturally, capitalism did promote art as a source of good investment, and it is capitalism which released new forms and contents of artistic production, brought to light this fact that art can expand evolving new styles and overcoming all limitations.

Renaissance was the first wave which opened a new world of creativity and passionately affirmed this fundamental truth that to live in this world is a matter of immense joy. The second wave led the path to the French Revolution and the banner of liberty, equality, and fraternity helped the artist to express the spirit of the age, and the concept of free man. Bourgeois - democratic values and ideological programmes of the rising bourgeoisie were the motif force of the age. During the two waves of Renaissance the inner contradictions of capitalism did manifest themselves in the form of wage slavery, narrow specialization, capitalist market of cruel competition. Liberty, idea of individual freedom, and the manifold creations of the artist were subjected to imprisonment, and alienation of individual from social connections came to light so distinctly that the division of labour and fragmentation of man and his world were expressed in the works of the time. Unity and wholeness completely disappeared from the social domain. Heine had rightly pointed out : 'Too fragmentary are world and life.' Artistic productions also suffered from this loss of unity and wholeness, from this fragmented world out look. This highly strange situation was nicely written by Arthur Miller : "I believe that we in America have arrived at the end of a development because we are repeating ourselves year after year,

and nobody seems to notice it."

The sincere artist with profound sense of humanism felt disillusioned and frustrated in such prosaic, highly materialized, fragmented world where division of labour and rigid specialization increased isolation and denied individual self and flight of imagination. Alienation tormented the humanist artist. The concept of alienation was first brought to light by Jean-Jacques Rousseau, and Hegel and Karl Marx developed the concept of alienation philosophically. Bertolt Brecht makes this concept of alienation in the bourgeois-capitalist world of production and profit very clearly striking in his 'Trader's song' :

> How should I know what rice is ?
> How should I know who knows what it is ?
> I've no idea what rice is.
> I only know its price.

In a note on Rousseau, Robert Musil wrote : "The great undivided life-force must be preserved..... The culture of social and psychological division of labour which smashes this unity into innumerable fragments is the greatest peril for the soul." – In the capitalist system as well as in the industrial society man becomes fragmented and alienated, his vision becomes limited, and loses his connection with the whole. The true artist could no longer affirm such a world of business and profit, and hence the historical movement of Romanticism came to light.

Romanticism was primarily and mainly a literary movement of vehement protest against the bourgeois capitalist world. Romanticism was an attitude which traces the path from business to creative production in the field of philosophy, lite rature, and art. Romanticism was a revolt against the classicism. Romanticism was a revolution in form and style and the first object of Romanticism was the purely literary object of getting rid of the vice of an unreal and artificial manner of writing. The Romantics desired simplicity of style and wanted freedom from the fixed form and content. The Romantics excluded themes of nobility : all common matters were included in this passionate and contradictory movement of Romanticism so much so that forbidden themes were encouraged and cultivated. Shelley aptly wrote in The Defence of Poetry : 'Poetry ..... makes familiar objects appear as if they were not familiar."

Division of labour, fragmentation of life and society and highly specialized application in all fields helped to make man alone and

incomplete and thus gave birth to a sense of powerful self-consciousness, a magical sense of strangeness and wonder and bewilderment. The Romantics embraced all these aspects of life and society and expressed themselves in different ways among which one is a sense of death and escape from the harsh realities of life to an unknown world and to the nameless world of death. The longing for nothingness and death emerged as the strong desire to escape from the gloomy atmosphere of emptiness and boredom of the capitalist world which showed clear signs of decay. The artists who painted sense of escape and death did not demonstrate reactionary attitude, on the other hand, they upheld progressive outlook precisely because of this fact that in a decaying society that art is truthful and bears the stamp of progress which faithfully reflects decay and inherent contradictions of a particular system.

The Romantic movement had its inherent contradictions and at every turning point of history, the movement split up between progressive and reactionary trends. But it goes without saying that artists and writers delightfully, and sometimes pensively attempted to bring out the dormant passion and emotion from the secret province of the heart of man. Romanticism was a great breakthrough as it enthused man to touch the border of the limitless horizon, to travel in the remote historical and medieval past, to celebrate nature, and also to merge oneself with national liberation struggles. Romanticism meant the clarion call of revolt against oppression, injustice, feudalism, foreign rule and everything that obstructs individual's absolute, unique, unbounded personality. Romanticism searched after a 'totality' of life in a lonely and inhospitable world. The romantics idealized folklore and folk art, and stirred up the people against the inhuman conditions of the capitalist market and the bourgeois values. Romanticism attempted to make man free from medieval bondage.

Romanticism is a historical event and a gigantic breakthrough. Romanticism led to a powerful self-awareness in an individual who constantly feels alone and incomplete in a situation of spiritual discomfort. In the following lines, Buddhadeva Bose, in his Sharl Baudelaire-O-Tar Kavita (শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা) describes Romanticism :

'রোমান্টিক' বলতে আমি বুঝি — শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে

মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয় — শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত; অনিশ্চিত, অবৈধ ও অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় — সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।
'মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী; মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন; মানুষ মুমূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্খী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্খী : বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে, এই বানী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।'

The romantic poet's 'I' is thus a frightening and uneasy awareness not for eternal peace but for endless unrest, not for static life but for the conquest of new realities. In content, form and language Romanticism is the turning point in the history of literature, and it is also a social turning point in the bourgeois-capitalist era.

সুফীবাদ ও রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য কাব্য

ডঃ মমতাজ বেগম
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

সুফীবাদ হল প্রেমবাদ। যে প্রেম অসীম ও অনির্বচনীয়। কিন্তু এই অসীমত্বে উত্তরিত হতে হলে প্রথম প্রয়োজন মানুষ ও মানবিকতার সাধনা করা। এটাই সুফীবাদের প্রথম পাঠ। 'সৃষ্টি প্রেমেই স্রষ্টাপ্রেমের বিকাশ। মরণ নদীর এপারে ওপারে ব্যাপ্ত জীবনের নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধিতেই এ সাধনার সিদ্ধি। তাই সুফী বলেন, - আত্মবিস্মৃত হয়ে সবাইকে প্রীতি দান কর আর পরের কল্যান কর্মে আত্মনিয়োগ কর। মানুষের হৃদয় জয় করাই সবচেয়ে বড় হজ। একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও বেশী; কেননা কা'বা আজর-পুত্র ইব্রাহিমের তৈরী একটি ঘর মাত্র। আর মানুষের হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর আবাস।' (বাংলার সুফী সাহিত্য - আহমদ শরীফ, পৃ. ২১) সুফীবাদের মধ্যে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈততত্ত্ব যেমন আছে তেমনি আছে ইসলামের একেশ্বরবাদের ধারণা। আবার পীরের প্রতি অনাবিল ভালবাসা এবং শিষ্টাচার সুফী সম্প্রদায়ের আত্মোন্নতির প্রধান সম্পদ। শাহ্ সুফী মাওলানা আহমদ সরহিন্দ মুজদ্দিদ আলফেসানীর লেখা মাকতুবাত শরীফের ১ম খণ্ড থেকে জানা যায় - ত্যাগ নেই যেখানে সেখানে ইসলাম অসম্পূর্ণ। আমিত্ব একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অপরের অশোভনীয়। সুফী আমিত্ব বিদায় দিয়ে মানবীয় গুণ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর বস্ত্র পরিধান করে। অর্থাৎ বাস্তবের আশা-অকাঙ্খা, লোভ তৃষ্ণা, ত্যাগ-তীতিক্ষার দ্বারা উত্তরিত হয় সুফী বা পবিত্রতায়।

সুফী মতবাদের চিন্তাধারা বাংলা সাহিত্যে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ যোগসাধনা, ব্রাহ্মণ্য, শৈব, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়ার সমবায়ে বাংলাসাহিত্যের চর্যাপদ, নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের মিশ্রমতে সুফীবাদের ছায়া স্পষ্ট। এছাড়া বাউল মতের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সুফীমত এক মোহনায় মিলেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্ত-ভগবানের প্রেমময় আকুতির প্রকাশ ঘটেছে। এর ফলে চিত্ত আলোড়িত হয়ে অনির্বচনীয় রূপ আস্বাদ করে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়। সুফী মতবাদের মধ্যে আছে সৌরভের স্পর্শ, সৌন্দর্যের পূজা, সংকীর্ণ গন্ডী উত্তরণের সাধনা। ধর্মীয় ও আচরণগত অবমাননাকর, ধর্মান্ধতাবর্ধক রীতিনীতি বর্জন করতে পেরেছেন বলেই তাঁরা সফেদ বা পবিত্র বা সুফী। সুতরাং সুফীবাদ কোন তত্ত্ব নয়, এক গাঢ় গভীর অনুভূতি মাত্র, স্বপ্ন-সুন্দর উদার-সুস্থ-মানবিকতায় যা দীক্ষিত। সুফীতত্ত্বের এই নিরীখে রবীন্দ্রনাথ একজন মস্ত বড় সুফী। কারণ কবির কল্পনা শুধু ভাষায়িত হয়নি তাঁর কাব্যে বরং জীবন রহস্যের গভীর অনুভূতিপ্রবণ বাণীকে মরমী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। সারাজীবনই তিনি সত্য-

শিব-সুন্দরের পূজা করেছেন। তাঁর 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' কাব্যদুটি সূফীসাধনার মূল বাণীকে আরও গভীর করে তুলেছে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমায় নৈবেদ্য কাব্য সম্পর্কে বলেছেন 'সর্বোচ্চ মানব আদর্শের জন্য, পূর্ণতর জীবনের জন্য চৈতালি থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত কবি-মানসের যে একটা ক্রমবর্ধমান আকূতি দেখা যায়, নৈবেদ্য-এ তাহা চরম রূপ ধারণ করিয়াছে। কবি একটা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য সভ্যতার অবদানের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা, আখ্যান মানব মহত্ত্বের পরিচায়ক, কবি সেগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া অপরূপ কাব্যে চিত্রিত করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বের গ্রন্থগুলিতে দেখিয়াছি, এই বৃহত্তম মানব আদর্শের যে চরম পরিণতি আধ্যাত্মিক জীবনে, শাশ্বত সত্যের উপলব্ধিতে, কবি ইহা নৈবেদ্য-এ ভালোরূপ অনুভব করিলেন। ত্যাগ, ক্ষমা, বৈরাগ্য, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মানব মহত্ত্বের দর্শনের উপর তাঁহার অনুরাগ ক্রম-পরিণতির পথে তাঁহার মহান আধ্যাত্মিক জীবনের যে রূপ ফুটিয়া উঠিল, তাহা মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ-অনেক পরিমাণে প্রাচীন ভারতের গৃহস্থাশ্রমী ব্রহ্মজ্ঞানীর আদর্শ।'

রবীন্দ্র চিন্তা-ভাবনায় সূফী আদর্শ, ঔপনিষদিক বিষয়, বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাব পড়েছে। তাই নৈবেদ্য কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই প্রার্থনাধর্মী, যেখানে আছে সংকীর্ণ গন্ডী উত্তরণের সাধনা —

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে,
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে। (১নং)

অথবা

আমার তুচ্ছ দিনের কর্মে
তুমি দিবে গরিমা,
আমার তনুর অণুতে অণুতে
রবে তব প্রতিমা। (৮নং)

কবি বিশ্ববিধানের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করেছেন, অনুভব করেছেন তাঁর অস্তিত্বকে দেহে-মনে-অস্থি-মজ্জায়। ড. ওসমান গনি তাঁর 'ইসলাম জগৎ ও সূফীসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন —

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন পারস্য কবি হাফিজের

হাফিজ। সেখান থেকে কবি গুরুর শরীরের শিরায় শিরায়, রক্তের কণায় কণায় ইসলামের তাসাউফ খরস্রোত নদীর মতো বেগবান ছিল।

সূফীবাদের মূল কথাই হল আত্মসমর্পন ও গভীর আত্মোপলব্ধি। যা সাধারণ গড়পড়তা মানুষকে করে তোলে আদর্শ মানব, যাকে অনুসরণ করে অন্যান্যরা। তাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে সূফী রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন —

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি (২০ নং)

প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে প্রথমেই ভারত তথা বিশ্বের বুকে সাম্যের বীজ বপন করতে চেয়েছেন কবি যা পরবর্তীকালে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও প্রেমের মহীরুহ জন্ম দিতে পারে। চিত্তের বিশুদ্ধকরণে পরমপুরুষকে পাওয়ার জন্য সূফীর আত্মসংগ্রাম বিরামহীন। কু-কামনা, কুচিন্তা, কু-বাসনা থেকে দূরে এসে এক নীরব-নিবিড়-নিগূঢ় আত্মসাধনার মধ্য দিয়ে বিশ্বের ঔদ্ধত্যকে ধ্বংস করে সাম্য প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

ইসলামের সূফীবাদ বা সূফীধর্ম হল - যা কখনই আচার সর্বস্বতার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সূফীগণের ধর্ম মানুষের ধর্ম, প্রকৃতির ধর্ম, যে ধর্ম চিরন্তন ও চলমান। যে ধর্মে সকল ধমনীতে একই রক্ত সদাই প্রবাহিত হয়, বৃষ্টি পড়ে, আলো ও আঁধার আসা - যাওয়া করে, সূর্য - চন্দ্র উদিত ও অস্তমিত হয়, সে ধর্মে মহাসমুদ্র, প্রবল জোয়ারভাঁটাতে আন্দোলিত হয়, নদীর বুকে অজস্র ঢেউ তরঙ্গায়িত হতে থাকে, সে ধর্মে এই পৃথিবী ফুলে ও ফলে শোভিত হয়ে ওঠে, বনানী তার চিরসবুজ রঙে চিরসবুজ, সে ধর্মে পাখির প্রভাত সঙ্গীত সারা বিশ্বকে নব প্রাণদান করে, সে ধর্মে জগৎ শিশু তাদের মা-কে একই সুরে আহ্বান করে, খেলার প্রাঙ্গণে এক সঙ্গে খেলে, বেলা শেষে এক মনে বাড়ি ফেরে, এরা জানে না কোনও হিংসা-বিদ্বেষ, অমঙ্গল-অকল্যাণ বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদি, এরাই তো নির্মল মানুষ। এরাই তো দেবতা, এরাই তো ফেরেশ্‌তা, এরাই তো কৃতকার্য, এদের ধর্মই সূফীধর্ম। তাই সূফী ধর্ম শান্তির ধর্ম (ড. ওসমান গনী কৃত কোরাণের বঙ্গানুবাদ ২৩:১, ৮৭:১৪, ৯১:৯-১০)

রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য কাব্যেও এ ধারণার অনুরণন শোনা যায় —
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায় / মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে, তারকার নিত্যকাল ধরে / অনুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল (২নং)

অথবা

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া (৩০ নং)

প্রকৃতির প্রতিটি ধূলি-কণায়, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি অস্তিত্বে, প্রতিক্ষণের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে, মোহ-মুক্তি, প্রেম-ভক্তি সব কিছুর মধ্যেই সেই এক ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেছেন। হিংসা-বিদ্বেষের, লোভ-লালসার স্তর অতিক্রম করলেই মন সূফী বা সফেদ হয়ে ওঠে। তখনই পরিপূর্ণ আনন্দলাভ সম্ভব হয়। ঈশ্বর বা বিশ্ববিধানের মূল রূপ হল দুটি - ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সসীম ও অসীম, মাধুর্যময় ও ঐশ্বর্যময়। একটি প্রাথমিক স্তর অন্যটি লক্ষের। বিরাট মহিমান্বিত সত্তার উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তের-সসীমের-মাধুর্যময়তার।

নৈবেদ্য কাব্যে সূফীবাদের আর একটি ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হল আধ্যাত্মবাদ। আমরা জানি যে ধার্মিক বা অধার্মিককে নিয়ে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে কোন সমস্যা নেই, সমস্যা ধর্মান্ধতা, চেতনান্ধতাকে নিয়ে। আধ্যাত্মিক পথের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হল ধর্মান্ধতা। যা কখনই অন্তর ধ্যানকে বলীয়ান হতে দেয় না। মানুষ এ জগতের প্রত্যেকটি বস্তুতে, জীবে সত্যের অনুসন্ধান করছে আর সূফীগণ সেই সন্ধান অনেকটা লাভ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে, আত্মউপলব্ধিতে পরিপুষ্ঠতা লাভ করে অনন্য মানুষ, মহামানুষ হয়ে উঠেছে। নৈবেদ্যের ৪০ সংখ্যক কবিতায় সে সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় —

শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে যে ইঙ্গিত, সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত যে ইঙ্গিত; শুভ্র শীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে উর্ধ্বে মুখে জাগি রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্ম-সাধনা একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তিনি সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র সমস্ত খণ্ডতাকে বিচ্ছিন্নতাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। মানুষের

মধ্যে যে আত্মশত্রু আছে তার বিকাশ ঘটে নীচতা, অন্ধতা, সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিকতার মধ্যে। এই 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'র উত্তরণের জন্য, মানুষকে সার্বজনীন নীতি ও আদর্শের দীক্ষা দেওয়ার জন্য কবি সব মানুষকে সূফী সাধনায় অগ্রবর্তী হতে বলেছেন, মানুষ হতে বলেছেন। তাতে দেশের ও দেশবাসীর কল্যান সম্ভব। আর 'ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত' এ আকুল প্রার্থনার ফললাভও সম্ভব। ভারতবর্ষ সকল ধর্ম-বর্ণ-জাতির মিলনের সঙ্গমস্থল। ১৯১০ এর গোরা উপন্যাসে পরেশবাবুকে গোরা বলেছিল –

আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই - যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না - যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা। অর্থাৎ এই সময় রবীন্দ্রনাথ সূফীতত্বের পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন। তাই তাঁর ভয় ভারতবর্ষ যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আদর্শে জ্যাত্যভিমানী হয়ে ওঠে, স্বার্থপর হয়, পরিপূর্ণ হয় হিংসা-দ্বেষে তাহলে —

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল ?? ঝংকারিত দুর্যোগ আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান। (৬৫ নং)

ইসলামী সূফীগন কোরাণের যে মূল আদর্শটি আঁকড়ে ধরেছেন তা হল -

'মনে রেখ, তোমাদের মনটি যেন থাকে সৎকর্মের দিকে' (কোরআন ২:১৪৮) সৎকর্ম ব্যতিত মানুষের মুক্তি নেই। স্বার্থপরতা একদিন ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবেই। বিশ্ববিধান এই নিয়মেই চলে। ৫১ সংখ্যক কবিতাতে বলেছেন -

ওগো অন্তর্যামী
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি
দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়,
তারে যেন ম্লান নাহি করে কোনও ভয়,
তারে যেন কোন লোভ না করে চঞ্চল
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জ্বল,
জীবনের কর্মে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহিয়ান।

অর্থাৎ সূফীরা যেমন কোন নির্দিষ্ট দেশের সীমানা বা মাটি জয় না করে মানুষের মন জয় করতে চেয়েছিলেন, সকলকে আত্মার পরম আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছিলেন নিজেদের কাম-ক্রোধ, লোভ-স্বার্থ ত্যাগ করে; তেমনি কবিও বলেছেন —

'তারে যেন কোনও লোভ না করে চঞ্চল'।

সূফী সাধনায় প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায় — (ক) আপন ব্যক্তিসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টাকে লাভ করা। (খ) সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টাকে লাভ করা। নৈবেদ্য কাব্যে দুটি ধারাই লক্ষ্যণীয়। প্রথম ধারার মাধ্যমে ঈশ্বর বা বিরাট বিশ্ববিধান কে আপন স্বত্তার মধ্যে কবি অনুভব করেছেন নানাভাবে - কখনো জীবনদেবতা, কখনো অন্তর্যামী, কখনো রাজাধিরাজ, কখনো রাজেন্দ্র ইত্যাদি নামে। স্রষ্টার মহিমাময় বিচিত্র সৃষ্টিতে তার প্রকাশ। সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্ট জীব মানুষ। তাকে ভালোবাসা, চলার পথের সাথী করাই সকল মানুষের উচিৎ কর্তব্য। আর জ্ঞান আমাদের জীবনকে জ্যোতির্ময় রূপ দান করে, যেখানে মৃত্যুও তুচ্ছ ঘটনা।

৫০ সংখ্যক কবিতায় মানুষের ঐক্যবোধ জাগরণের জন্য সচেষ্ট সূফী রবীন্দ্রনাথ।

তিনি বলছেন —

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারা বেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা খেলা
মুগ্ধ ভাব ভোগে, সেই বৃদ্ধ শিশু দল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুওল

তোমারে যারা ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্য ধারা।

মহান সূফী ফরিউদ্দিন আত্তার সূফী তত্ত্বের অভিজ্ঞতাকে সাতটি স্তরে ভাগ করেছেন - (১) সন্ধান (২) প্রেম (৩) ভজন (৪) নির্লিপ্ততা (৫) একাত্মতা (৬) নীরবতা (৭) আত্মবিস্মৃতি

সন্ধান অর্থাৎ বিশ্ববিধানের অনুসন্ধান, তাকে চেনা-জানা ও বোঝার চেষ্টা। এই ধরণের প্রেমে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার কোন স্থান নেই। নানা বিস্ময়, বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এক অবর্ণনীয়, অপরিসীম সৌন্দর্যলোকে উত্তরণ। যে সৌন্দর্য প্রেয়সীর থেকেও অদ্ভুত সৌন্দর্য। জ্ঞান বলতে পরম জ্ঞান, যার দ্বার ইন্দ্রিয়ের দ্বার অতিক্রম করা যায়। অন্তর এক অভূতপূর্ব আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নির্লিপ্ততার স্তরে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ খুঁজে পান না। একাত্মতার স্তরে সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়। এই পাঁচটি স্তরই রবীন্দ্রনাথ একের পর এক পেরিয়ে এসেছেন। তাঁর প্রথম সার্থক শিল্প সম্মত গ্রন্থ মানসীতেই এই সব রূপই কম বেশি ধরা পড়েছে। 'মানসী' কাব্য সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য বলেছেন —

'আত্মশক্তিতে তিনি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন এবং সার্থক ও
ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দপ্রয়োগে এবং মনোমত ছন্দে তাঁহার ভাব ও
কল্পনাকে রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই বিশ্বের
অবারিত শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস—গন্ধ তাঁহার হৃদয় বেলায়
অবিরাম তরঙ্গাঘাত করিতেছে। এই আঘাতে তাঁহার প্রাণে
বিচিত্র অনুভূতি ও ভাব জাগিতেছে।'

এছাড়া মানসীর প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমের অসীম, অনন্ত আত্মার স্পন্দন অনুভব করা যায়। এই প্রেম 'দেহসম্বন্ধবিরহিত, অপার্থিব সৌন্দর্যের অনুভূতি - এক অনির্বচনীয় আনন্দরস।' কবির এই অনুভূতি ভাষা পেয়েছে —

পঞ্চ শরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে

রুদ্ধ দিনের দুঃখ পাইতো পাব,
চাইনা শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায় জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।

এই প্রেম সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা জর্জরিত প্রেম নয়, এ প্রেম 'নিকশিত হেম' যা সূফীবাদের প্রেম। কারণ আত্মকেন্দ্রিকতা এর মধ্যে নেই, ত্যাগ-তপস্যা-কর্ষিত পরিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রেম।

আমি বা তুমি ব্যক্তি নয় প্রতীক মাত্র। তাই তার উৎস আদিতে, প্রকাশ নিত্যনূতনে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিক প্রেম নয়; সামগ্রিক প্রেমই অনুভবের গভীরে আলো জ্বালাতে পারে। অসীম সৌন্দর্য ও বিশাল বৈচিত্র্যে বিস্মিত কবি প্রাণ নির্লিপ্ততা ও একাত্মতায় উপনীত হয়েছে। নৈবেদ্য কাব্যের ২৭ নং কবিতায় —

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।
তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ।

মানসীতেই কবি উপলব্ধি করেছিলেন এই ভাঙা-গড়া, জীবন-মৃত্যু আসলে একই সত্যের দুটি রূপ —

দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান
সে কথাটি কেবা জানে। (উৎসর্গ)

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতির প্রথম জন্ম এখানে। 'সোনারতরী', চিত্রা, চৈতালীতেও এই একাত্মতার ভাব লক্ষ্যনীয়। ছিন্নপত্রাবলীর পাতাতেও সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি —

এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার

মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। (৭০ নং পত্র)। নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে সূফীবাদ, সূফীভাবনা, সূফী ভাবধারা সবই প্রেমে, জ্ঞানে, সৌন্দর্যে, একাত্মতায় উপলব্ধির গাঢ়তায় সত্যরূপ লাভ করেছে। যে সত্য ব্রহ্মের স্বরূপে সত্য। এ জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম-জ্ঞান-একাত্মতা সবকিছুতেই ভগবান বা ঈশ্বর বিরাজিত। সূফীবাদের শেষ দুটি স্তর নীরবতা ও আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বচরাচর তাঁর কাছে চরম বিস্ময়। তাঁর চক্ষু-কর্ণ যা দেখে, যা শোনে তা বর্ণনাতীত। নিজের সমস্ত কিছুকে ভুলে গিয়ে 'ফানা' বা লীন হয়ে যান পরমাত্মার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের এই অনুভব ঘটেছে গীতালী-গীতিমাল্য-গীতাঞ্জলির কাব্য-কবিতায়। সূফীধর্ম কোনও যুক্তি-তর্ক-জ্ঞান-গরিমার প্রয়োগ বা প্রজ্ঞার ধর্ম নয়, এটা হল নিছক আত্মোপলব্ধি ও আত্মসাধনার ধর্ম, সমস্ত হিসেব নিকেশের বাইরে। উপলব্ধি সত্য, তবে উপলব্ধির প্রকাশ বিভিন্ন।

সূফীবাদকে ঘিরে আমাদের নানা প্রশ্ন ও প্রাপ্তি ঘটলেও তা আজও আমাদের বিস্ময় জাগায়। কখনো কখনো কারও তত্ত্ব বা মতবাদ বিভ্রম ও বিড়ম্বনা তৈরী করে সূফীবাদের বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নে অঘটন ঘটায়। তবু সূফীবাদ মরমে মরমে পল্লবিত ও বিকশিত এখনও বহু আত্মার সাধনায়। রবীন্দ্রনাথ সূফীবাদের মূল তত্ত্বকে বুঝে অনুভব করেছিলেন, আত্মস্থ করেছিলেন এবং ব্যক্ত করেছেন সাহিত্যে। সমালোচকদের মতে সূফীবাদে বৌদ্ধ, বেদান্ত, খ্রিষ্টান, পারসিক, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের প্রভাব আছে। আসলে সূফীবাদ সকল ধর্মের উর্দ্ধে। যে যেমন করে তাকে আস্বাদন করবে সে তেমনই আস্বাদ পাবে। মানুষ যখন তার মানবিকতা, মনুষ্য ধর্মের লালন-পালন চর্চা করবে তখন আপনিই সে অনুভবের রাজ্যে বিশ্ববোধের রাজ্যে প্রবেশ করবে। সুতরাং সূফীবাদ প্রেমে জন্ম নেয়, প্রেমে বিকশিত ও বিস্তারিত হয়। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ যেন সেই প্রেম স্বর্গের গভীর নিবাস।

JANE AUSTEN : A LIFE IN SECLUSION

Soma Mondal
Eng. Dep.

It was the middle of November 1815. The Reverend Mr. James Stainer Clarke, Librarian to the Prince Regent was having a correspondence with a budding authoress. When Mr. Clarke requested her to "delineate in some future work the Habits of Life and character and enthusiasm of a clergyman - who should pass his time between the metropolis and the country ....." he found the lady modestly replying that she was not capable of drawing such a clergyman. She also said "..... I think I may boast myself to be with all possible vanity, the most unlearned and uninformed female who ever dared to be an authoress."

And this "unlearned" and "uninformed" female was none other than Jane Austen – the writer of six delightful novels including the most popular "Pride and Prejudice".

Austen's keen awareness of her "limitations" has paved the way for an age-old controversy among the critics while the notion of "unexposed", "sheltered spinster" has been associated with her persona, her works have been criticised for the smallness of range - if by 'range' we mean the depiction of social diversity, political background or historical changes. Her novels do not encompass history the way Scott's " The Heart of Midlothian" does. In fact she has been labelled as "a miniature painter" by her critics. Most vehement criticism has been made by one of her contemporaries – Charlotte Bronte – the writer of 'Jane Eyre.' Bronte criticised 'Pride and Prejudice' for presenting "An accurate daguerreotyped portrait of a commonplace face; a carefully fenced highly cultivated garden, with neat borders and delicate flowers; but no glance of a bright, vivid physiognomy, no open country, no fresh air; no blue hill, no bonny beck. I should hardly like to live with her ladies and gentlemen, in their elegant but confined houses."

On the other hand, there are critics who thought her novels to be marked by "silvery commonsense". Macaulay compared her to Shakespeare. John Baley found 'the pleasures and perceptions' offered by Austen to be of a very "complex kind".... "Each re-reading strikes us afresh with something newly significant, and some change

in the perspective of our own world in relation to hers."

However, Austen herself was too conscious of her position as a novelist. Born on 16th December, 1775 at Steventon in Hampshier she was the seventh child in the family of George and Cassandra Austen. Her father was the rector of the parish Church in Steventon, a small village in the South of England. Jane had six brothers and one sister Cassandra with whom she had a most intimate relationship. All the family members shared a loving relationship as her nephew James Edward Austen. Leigh writes in the Memoir

"The family talk had abundance of spirit and vivacity, and was never troubled by disagreement even in little matters, for it was not their habit to dispute or argue with each other : above all, there was strong family affection and firm union never to be broken but by death....."

It was this little family circle which formed the mind of our novelist. In those days women had little exposure to the outer world. Jane and her sister Cassandra engaged themselves in indoor occupations of reading, drawing, music and of course writing while her brothers enjoyed riding, hunting and shooting. Both Jane and Cassandra were sent to school but for a short period of time. She learned French, some Italian at home. Only amusement they had was the performance of family theatricals in the neighbouring barn. Jane's Juvenilia written from 1787 to 1793 - short novels, sketches, batches of fictional letters, playlets – were written basically for the entertainment of her family. She scarcely went outside the South of England and knew little about the industrial changes in the north. Jane moved into the provincial societies of Bath, Southampton and Chawton. She never married. In 1802 she received a proposal of marriage from Harris Big Wither – she accepted the proposal only to withdraw it next morning. Eventhough she lived in an age illuminated by the glory of romanticism she seemed to be untouched by its aura. She was not influenced by the revolutionary ideas of her contemporaries – Wordsworth, Byron or Coleridge. In fact, her artistic values were inspired by Cowper, Dr. Johonson and Richardson. Throughout her life she remained far away from the literary circle. There has been a deliberate attempt on her part to remain unnoticed; her nephew depicts the scene in 'the Memoir' : how she was writing her novels : "she had no separate study room to retire to and the most of the work has been done in the general sitting room, subject to all kinds

of interruptions, she was careful that her occupations should not be suspected by servants, or visitors, or any persons beyond her family party."

Yet this singularly uneventful life of Jane Austen delighted much in what was happening around her – the family happenings provided her with materials which she could paint such "intricate" characters in her novels; Never was a novelist so much conscious of the materials as she had been. She never ventured on themes which she thought not to be her forte. She once wrote to her neice "3 or 4 families in a country village is the very thing to work on." Yet we cannot but be moved by the sparkle of her "little two inches of ivory". In all her novels she has dealt with the predicament of unmarried women in a patriarchal society with the acumen of a satirist. But the ironic tone of her narrative never gets bitter. In fact, she has depicted her characters with a loving care : in a letter to her sister Cassandra Austen wrote about Elizabeth - the heroine of "Pride and Prejudice". .... "I must confess I think her as delightful a creature as ever appeared in print", she also described Emma Woodhouse as a heroine whom 'no one but myself will much like." Throughout her career she cared little for any recognition. She contracted Addison's disease in 1817 and passed away silently on 18th July, leaving behind a legacy of six novels which keep her memory alive for ages to come.

****

1) Memoir of Jane Austen – James Edward Austen Leigh

2) Literary History of England edited by Albert C Bangh (iv)

3) Letters :

অরণ্যের অধিকার

বস্তুবাদী ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রতিবেদনধর্মী উপন্যাস

উত্তম পুরকাইত
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

"It is not the literal past, the 'fact's of history, that shape us, but images of the past embodied in language..... We must never cease renewing those images, because once we do, we fossilise!"(ব্রায়ান ফ্রিয়ল)

— ইতিহাসের সময় থেকে ঔপন্যাসিক আবিষ্কার করেন ইতিহাসের নির্যাস। বস্তুবাদী ঐতিহাসিক পুঁথিবদ্ধ ইতিহাসে সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন না। ইতিহাস নামক রাজন্যবর্গের ইতিকথা অথবা বিদেশী ইতিহাস চর্চার ধারণার অন্তরালে আদিমানবের স্বাধীকারের আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও মুক্তির অবিরাম প্রচেষ্টাকে খুঁজে বেড়ান একালের ঐতিহাসিক। Human Science এর ধারণায় মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস আদি অধিবাসীদের পরাজয়, গ্লানি ও মুক্তিসংগ্রামের লড়াই। মহাশ্বেতা দেবী স্পষ্টতই উচ্চারণ করেন — "পুঁথিগত ইতিহাসে আমার কোনো আস্থা নেই। দুই লাইনের ফাঁকে যে সাঁদা অংশ, আমি ঐখানে ইতিহাস লিখি।" বস্তুত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতার তফাৎ এখানেই। আক্ষরিক অর্থে যা অতীত, সেখানে ইতিহাস নিছক তথ্যসমষ্টি। সংবেদনশীল ঔপন্যাসিক যান্ত্রিক ইতিহাস খোঁজেন না। তাঁর উপন্যাসের প্রতিবেদনে ব্যক্ত হয় সময়ের অন্তঃস্বর, কল্পনার অভ্রভেদী হস্তক্ষেপে অতীত পুনর্নির্মিত হয়। ভারত ইতিহাসের সেই অন্তঃস্বর আদি-কৃষ্ণ ভারতবাসীর জাগরণ। লেখিকা এখনো বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার এখনো বহুদূর প্রক্রিয়া। একটা বীরসামুণ্ডা অতীত ও ভবিষ্যতের চিরকালীন লড়াই-এর প্রতীক মাত্র। বীরসারা রক্তবীজের জাত। আদি ভারতবাসীর এই বিদ্রোহ চলতেই থাকবে। দক্ষ সাহিত্যিক যখন বাস্তবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করেন তখন ঐতিহাসিকের প্রচেষ্টা শিল্পীর সংবেদনশীলতায় প্রাণ পায়। সভ্যতার অতীত ও ভবিষ্যতের চেহারা আরও বেশি খোলস মুক্ত হয়।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে গণচেতনা এসেছে চল্লিশের দশকে। 'আরণ্যক'-এ গাঙ্গতাদের জীবনকে দিনপঞ্জির প্রতিবেদনে উপন্যাসে পরিণত করেছিলেন বিভূতিভূষণ। অরণ্যবাসীদের কাছে ভাত এক মহৎ স্বপ্ন, যে ঘাটো খেয়ে তারা জীবন ধারণ করে লেখক একদিন মুখে দিয়ে তার তিক্ততাকে ভুলতে পারেন নি। তিন মাইল পথ পেরিয়ে রাতের অন্ধকারে কুন্তা এসে দাঁড়াতো ম্যানেজারবাবুর অবশিষ্ট ভাতের জন্য। কিন্তু কালের প্রতিধ্বনি বিভূতিভূষণের শিল্পকে সে ভাবে স্পর্শ করেনি। এমনকি 'অশনি সংকেত'ও দুর্ভিক্ষের ডকুমেন্টরী যেন। তারাশঙ্করের করালী প্রথম প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল, আত্মমর্যাদার

দাবি জানিয়ে - "উ কি? বেটা বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দর লোকের উ কি কথা।" — এলিট ভারতীয় সমাজের কাছে প্রান্তবাসী আদিবাসী মানুষের এই আত্মসম্মানের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা জোরালো ভাবে ঘোষিত হল সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানসে'। ঢোঁড়াই প্রথম ভোটাধিকারের দাবি জানায়, রামায়ণ পাঠ করতে চায়। যে অধিকার স্বয়ং রামচন্দ্র শম্বুক হত্যা করে কেড়ে নিয়েছিলেন। বস্তুবাদী ঔপন্যাসিকদের চোখ এই আঞ্চলিক জনজীবন থেকে, ভারতীয় পুরাণ, লৌকিক আখ্যান, পুরাকথা থেকে খুঁজে পেয়েছে ভারত ইতিহাসের অপমানিত, নিপীড়িত অদি কৃষ্ণ ভারতীয়দের দীর্ঘকালীন ক্রন্দন ও মুক্তি আকাঙ্ক্ষার লড়াই। মধ্যবিত্তের বিলাসী জীবনের পণ্যাপোন্যাসের উল্টো দিকে রমেশ সেনের - 'কুরপালা', অমিয়ভূষণের - 'মহিষ কুড়ার উপকথা' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' 'রাজনগর'-এই পথেই লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী এসেছেন বস্তুবাদী ইতিহাস ও গণচেতনার বিশ্বাস নিয়ে। সত্তরের রাজনৈতিক উত্তাপকে ভিন্নমাত্রায় অঙ্গীকার করে বীরসার 'উলগুলানকে' বিবেকি পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন। উপন্যাস ভাবনা প্রসঙ্গে লিখেছেন - " ..... সত্তরের দশকে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মানসিক নির্বীর্যতা ও অন্ধকার অবক্ষয়ের চূড়ান্ত চেহারা দেখলাম। দেশ ও মানুষ যেখানে প্রত্যহ রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় দীর্ণ বিদীর্ণ হচ্ছিল সেখানে বাংলাসাহিত্য এত বড়ো যন্ত্রণার শিক্ষাকে অস্বীকার করে পরীর দেশের অলীক, স্বপ্নাশ্রয়ী বাগানে মিথ্যে ফুল ফোটাবার ব্যর্থ, আত্মঘাতী খেলায় ব্যস্ত রয়ে গেল। ..... আমি বিশ্বাস করি, গণ ও সমাজ জীবন আশ্রিত ইতিহাস চর্চায়। ইতিহাস চর্চা আমার মতে, সাহিত্য স্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক, মূল শিক্ষা। ... প্রতিবাদের জন্য চীৎকৃত প্রতিবাদে আমার আস্থা নেই। আমার প্রতিটি লেখাতেই আমি প্রতিবাদকে বক্তব্য করে তুলি, যখন প্রতিবাদের প্রেমিস থেকে শুদ্ধতর, আরও প্রয়োজনীয় কোনো প্রেমিসে উত্তরণ সূচিত করতে পারি।" ('এবং মুশায়েরা')। —

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে আদিবাসী বিদ্রোহের সূত্রধর ধানীমুণ্ডা। লেখিকা ধানীর ভাবনা ও রূপকল্পে এই বিদ্রোহের সুদূর অতীত ও ভবিষ্যকে আঁকতে চান। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবাদে আদিবাসী বিদ্রোহের যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে সে বিদ্রোহের উৎস সেদিন থেকে, যেদিন ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা তাদের অরণ্য জননীকে হারিয়ে ছিল। অরণ্য জননীকে যে সব শাসকেরা অশুচি করেছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ। সভ্যজাতির কোন গ্রন্থ এই ইতিহাস লেখেনি। অমূল্যের মত বিবেক দংশন সচরাচর দেখা যায় মাত্র। তবু বস্তুবাদী ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপটরূপে ইতিহাসের সময়কে যতটা সম্ভব উল্লেখ করেন। উপন্যাসের মূলকাহিনীর প্রেক্ষাপট বীরসার জীবনের পঁচিশটা বছর, চব্বিশটা চাঁদ দেখেছিল বীরসা। এই ইতিহাসের তথ্যের জন্য ঔপন্যাসিক সুরেশ সিং-এর ডায়রি - 'Dust Strom and Hanging Mist' গ্রন্থটির ঋণ স্বীকার করেছেন। তবে ঐতিহাসিক প্রতিবেদন ১৮২০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত

আদিবাসীদের মুলুকি লড়া কেই ধারণ করেছে। ছোটনাগপুরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে বারবার। কৌম সমাজের রক্তে পরাজয়ের গ্লানি, যন্ত্রণা তুঁষের আগুনের মতো সঞ্চিত থাকে। শাসকদের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ অরণ্যের বাতাসে বারুদের মত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত নড়িয়ে দিলেও, সে লড়াই মূলত ভাতের জন্য, "মুন্ডা শুধা ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মত ভাত খাবে না।" চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৭-১৮০৫), মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮১৮), হো বিদ্রোহ (১৮২০-২১), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) কোল বিদ্রোহ (১৮৮৯) মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০) — এই সমস্ত বিদ্রোহ কেবলমাত্র বিদেশী সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। ছোটনাগপুরের কৌম জনসমাজে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির পীড়নের পাশাপাশি মহাজন ও জমিদারদের, বৃহৎরূপে সমস্ত তথাকথিত সভ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত সমাজের অত্যাচার ইতিহাসের উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে চরম আকার নিয়েছিল। কিন্তু অতীতের সমস্ত বিদ্রোহের থেকে বীরসার বিদ্রোহ পেয়েছিল স্বতন্ত্র তাৎপর্য। বীরসা শুধু 'হুল' বা বিদ্রোহের ডাক দেয়নি, ডাক দিয়েছিল 'উলগুলান' বা মহাবিদ্রোহের। আদি ভারতীয়দের কাছে অঙ্গিকার বদ্ধ হয়েছিল অরণ্য জননীকে ফিরিয়ে দেবার। তার এই শুদ্ধতর প্রেমিস কীভাবে তার অন্তর থেকে আরও বড়ো প্রেমিসরূপে সমগ্র আদিবাসী জীবনে ছড়িয়ে পড়ে অন্তহীন সংগ্রামে মুণ্ডাজীবনকে উদ্বুদ্ধ করে - ইতিহাসের সেই নির্যাস আবিষ্কারই 'অরণ্যের অধিকারে'র প্রধানতম আকল্প।

বীরসার উলগুলানকে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের রূপ দিতে লেখিকা ছোটনাগপুরে মুণ্ডাদের বসবাস, তাদের অরণ্য জননীর প্রতি বিশ্বাস, কৌম জীবনের অলৌকিক রূপকথা ও সর্বোপরি বীরসার 'ধরতি আবা' হয়ে ওঠা এবং বীরসার অহিংস থেকে সহিংস— বিদ্রোহের ক্রমিক চিত্র এঁকেছেন। ধানী মুণ্ডা জানিয়েছে - "হা দেখ্, বীরসার বংশের আদিপুরুষ ছোটনাগপুর পত্তন করে। কিন্তু রাজা হল অন্যে! সে হতে আমাদের মাটিতে জঙ্গলে বাইরে হতে লোক এসে সব কেড়ে নিল। অন্য জাতের, অন্য দেশের মানুষ।' — ইতিহাসের তথ্য বীরসাদের রক্তের মধ্যে এই পরাধীনতার গ্লানিকে ধরতে পারতো না। ইতিহাস সচেতন লেখিকা দেখান, কোনো বিদ্রোহ, বিপ্লব আকস্মিক ঘটে না। বীরসার জন্ম, মুণ্ডাদের জন্ম পরাধীনতার বঞ্চনা নিয়ে। দু-মুঠো অন্নের জন্য দিকুদের দাসত্ব করে, ধর্ম বদলে খ্রীশ্চান হয়, আবার বিদ্রোহ করে মিশন ছাড়ে; বনে বনে ঘুরে বেড়ায় ঘর বাঁধে, ঘর ভাঙে। মুণ্ডা জাতির জীবনে আগুন জ্বলে আর নেভে। বীরসার আগে কতবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে, আবার সব ঠান্ডা শীতল। বীরসা লেখাপড়া শিখে বড়ো হতে চেয়েছিল, শান্ত-শীতলভাবে গড়ে তুলছিল তার জীবন। কিন্তু মুণ্ডাদের রূপকথার মতো সিংবোঙা আকাশ থেকে আগুন ফেলে, সে আগুন অরণ্যকে পোড়ায়,

মুণ্ডাদের রক্তেও আগুন জ্বলে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের আইনের অত্যাচারে মুণ্ডার অরণ্য হারিয়েছে। ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ১৮৭৮ সালে ছোটনাগপুর মুণ্ডাদের মালিকানার দাবিতে মুণ্ডারা আর্জি জানায়, সে আর্জি বিফল হয়েছে। ১৮৮১-তে সর্দাররা মিশন ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল এই বলে - "মোরা মেয়েলের চিল্‌রেন বটি। আমাদের নেতা এক মুণ্ডা, জন দি ব্যাপটিস্ট। ছোটনাগপুরের রাজাদের আদিম ঠাঁই দোয়েসা যেয়ে রাজ বসাব।" - এই আস্ফালন টেকেনি। বীরসা মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে চিনেছিল। অথবা তাকে চিনতে হয়নি, বিদ্রোহের উত্তাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ভেঙে বারবার ঢুকে পড়েছে এই সংবাদ যে, সরকার মুন্ডাদের আর্জি শোনে না, সাহেবরা তাদের স্বার্থ দেখে, সরকারও যা, সহেবরাও তাই, দিকুরা কখনো মুণ্ডাদের জন্য ভাবে না, বরং সেইসব সামন্ত শাসকেরা সরকারের সহযোগিতায় মুণ্ডাদের বিতাড়িত করে। সিংবোঙার আগুনের মত মুণ্ডারা যখন অত্যাচারে জ্বলে-পুড়ে মরছে, আর স্বপ্ন দেখেছে - এক মুণ্ডারী যুবক ও একটি মুণ্ডারী নারীকে, টুইল্যা বাজিয়ে সেই যুবক নারীটিকে মুগ্ধ করছে, সেংগেলদারের আদেশে আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেতে কাঁকড়ার গর্তে তারা আশ্রয় নেবে, তারপর সিংবোঙার আগুনে পুড়ে যাওয়া পৃথিবীতে সেই যুবক আবার মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা করবে। সেই রূপকথার মত বীরসা খুঁজে পায় নিজেকে।

বস্তুবাদী ঔপন্যাসিক হলেও মহাশ্বেতা দেবী বীরসার ধরতি আবা হয়ে ওঠার রূপকথাকে অস্বীকার করেন না। কারণ এই রূপকথার আড়ালে লুকিয়ে আছে আদি কৃষ্ণ ভারতের অন্তরের কথা, তাদের রক্তের ক্রন্দন। আদিম কৌম জীবনকে বীরসা যদি না মেনে নিত, তবে তার পক্ষে উলগুলানের ডাক দেওয়া সম্ভব হত না। বীরসা মুণ্ডাদের বিশ্বাস, ধর্মবোধ ও রক্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা খুটখাট্টি, গ্রাম পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলে মুণ্ডা বিদ্রোহের ব্যর্থতা, অন্তর্বিরোধ, ও বিচ্ছিন্নতা ঢাকতে চেয়েছিল। সর্দারদের মুলুকি লড়াই-এ তাদের স্বার্থ বীরসার দৃষ্টি এড়ায়নি। বীরসা বিদ্রোহের পথ আবিষ্কার করে নিজের মত করে। সমস্ত মুণ্ডাদের কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে তার কণ্ঠে। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে ঔপন্যাসিক মন, তারিখ, স্থান-কাল চিহ্নিত ঐতিহাসিক প্রতিবেদনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন বীরসার বীরসাইতের ধর্ম ও অরণ্যকে ফিরিয়ে দেবার রাজনৈতিক শ্লোগান। তাঁর সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতিটি অভিযান উঠে এসেছে উপন্যাসের পাতায়। মুণ্ডাদের আপ্রাণ চেষ্টা - সমস্তই ঘটেছে ইতিহাস সম্মতভাবে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিকতা এই ইতিহাসের তথ্য গুলিকে ছাড়িয়ে যায় যখন বীরসা বলে, 'উলুগুলানের শেষ নাই, আমার মৃত্যু নাই।' মুণ্ডারাও বিশ্বাস করে 'ভগবানের মৃত্যু নাই।"

ঔপন্যাসিকের প্রতিবেদন জানিয়ে দেয়,'বীরসার মৃত্যু কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বিনা বিচারে আটক রেখে কোর্টে তোলার আগেই অসংখ্য মুণ্ডার মৃত্যু ঘটানো হয়। বিচারের নামে চলে প্রহসন। তবু অমূল্যের ডায়রি জানিয়ে দেয়, কলেরা নয়, বীরসাকে

বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। মুণ্ডাদের চোখে যে ভগবান, শাসকের চোখে সাধারণ এক মুণ্ডা, আর বীরসার আবাল্য বন্ধু অমূল্যের দৃষ্টিতে বীরসা শুধু এক প্রতিভাবান ছাত্র নয়, অসাধারণ বিপ্লবী; যে তার অরণ্যবাসীদের কে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভোলায়নি, মরতে শিখিয়েছে, স্বদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গের মহান ব্রত ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। জেকবের মত সহৃদয় সাহেব শাসকের চক্রান্তের হাত থেকে বীরসাকে রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদাও দিতে পারেন নি, কিন্তু বিশ্বাস করেন — "আমি মনে করি বীরসা নিপীড়িত মুণ্ডাদের উপযুক্ত নেতা, যোগ্য মুখপাত্র।" — ঔপন্যাসিক বীরসাকে ধরতে চেয়েছেন এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ইতিহাসের একমাত্রিক ধারণায় নয়। বীরসার জীবন উপন্যাস হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের সংবেদনশীলতার গুণে। যে ভাতের স্বপ্ন নিয়ে বীরসার মহাবিদ্রোহ ভগবানের নির্দেশ অমান্য করে সেই ভাতের নেশায় উনান ধরাতে গিয়েই পরমী বীরসাকে ধরিয়ে দেয়। বীরসার অন্তরাত্মায় শুধু অরণ্য জননী প্রতিধ্বনি ছড়ায় না, করমীর কান্না, সালীর বুকে পাথর চাপিয়ে নীরবে বীরসার কর্তব্য পালন, সুগানা মুণ্ডার পুত্রের জন্য গর্ববোধ, শত শত মুণ্ডার চোখের জলে ভগবানকে বিদায় জানানো — ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। 'অরণ্যের অধিকার' উলগুলানের অঙ্গীকার, বীরসা আদি কৃষ্ণ ভারত ইতিহাসের মূর্তিমান নায়ক। মৃত্যুতেই যার জীবন শেষ হয়ে যায় নি, প্রতিবাদের প্রেমিসকে আরও প্রয়োজনীয় প্রেমিসে উত্তীর্ণ করে যিনি ইতিহাসে আজও সমানভাবে বেঁচে আছেন। এখানেই এই ঐতিহাসিক প্রতিবেদনের সার্থকতা।

****

PLAY SCHOOLS AND LANGUAGE PLAY : THE ROLE OF RHYMES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Amita Ray
B.Ed. Department

In functionalist linguistics child language has been a topic for insightful research work and volumes have been churned out on adult - children speech, child directed speech and child-child interaction. These studies focus on language which take into account mainly verbal responses from the child rather than upon the language which the child is silently steeped in or receptively occupied for eg. listening to children's programmes, rhymes, verses, jokes, or reading aloud from children's literature. The functional significance of such linguistic environment though less tangible and hypothetical deserves a close speculation in the light of rational deduction.

In this spirit of speculation let us consider how English rhymes which are popular and widely used as pre-linguistic play in the pre school stage appear to a child on the threshold of school life. It may be mentioned here that these children who are thrust into an environment of play schools where English rhymes are generously used in our country become engaged in simultaneous bilingualism. The learners are introduced to a second language much before the rudiments of their first language or mother tongue is firmly established. Thus the child finds himself in the midst of both social and cognitive challenges. Extensive exposure to rhymes delivered by the teacher where the learner is only receptively engaged provide the platform for encountering these dual challenges.

The following two rhymes are taken for consideration :

Teddy bear Teddy bear / turn around,
Teddy bear Teddy bear / touch the ground,
Teddy bear Teddy bear / polish your shoe,
Teddy bear Teddy bear / off to school.

Round and round the garden,
Like a teddy bear,
One step, two step,
And tickle you under there.

Now let us analyse how these two rhymes which definitely pave the path to an ear for English language leading to its use in later

years is passively absorbed by the child. Both the rhymes are action certric, demanding collaboration from the child particularly the second rhyme where the teacher uses two fingers to walk around 'the garden' of the child's palm ending up by tickling her. Similarly the first rhyme is a blend of functional activity and language play where the teacher mimics the actions and moves forward holding the child's hand while uttering 'off to school'.

To an adult, the rhymes signify a playful use of language at three levels :

1) Of linguistic form : The rhymes have a definite sound pattern, intonation, syntax phonemes and morphemes.

2) Semantic meaning : They deal with a character (Teddy bear) and related events and hence impart a definite meaning.

3) Pragmatic use : They bond the child with the teacher on a communicative plane.

However to the child, totally devoid of the principles of grammar and phonology these rhymes will fail to deliver this three dimensional impact. The child will only be enchanted by the overt rhythm and melody of the verses, hilariously impressed by gestures and active interaction climaxing in a surprise tickle (in case of the second verse). The child at this age does not also understand the rhymes, not only because the language is alien but also because he is unlikely to know the concepts signified by language units such as 'polish your shoes', 'round the garden' etc.

On the other hand even at this tender age, though the child does not see the rhymes as 'language' constant exposure to such rhymes will define his perceptions and enable him to sense two underlying aspects in the use of language.

They are follows :

1) Rhythm and intonation

2) Interpersonal interactions through gestures, eye contact, touch, facial expressions etc.

Both of these in essence are instances of 'Para Language' intrinsically associated with all verbal communication.

However, through apparently meaningless rhythmical structured stream of linguistic items associated with sensory contacts, actions, the child is initiated to a sense of linguistic form (not yet Language to

him) and simultaneously he embarks on the process of social communication. Moreover it is through such rhythmic speech sound and interaction that the child is slowly but positively ushered into the realm of syntax and semantics. For eg. in the first rhyme, the first two stresses fall upon the repetitive use of the subject "Teddy bear". The next stresses fall on the varying predicates which rhyme. In addition, the repetition of the subject with different predicate (similar to substitution table drilling for language teaching) points to an overall scheme of language structure.

Two other rhymes widely used in play schools can be cited to reinforce this basic concept of sentence pattern in the cognitive domain of early school goers through stress, rhyme and intonation.

Hickory Dickory Dock,
The mouse / ran up the clock,
The clock / struck one,
The mouse / ran down,
Hickory Dickory Dock,
Roses / are red,
Violets / are blue,
Sugar / is sweet,
And so / are you.

The natural language learning ability or the process described as 'creative construction' (Durrey Brut and Krashen 1982) stealthily begins to work in children through rendering of such rhymes by the teacher. This is also in compliance with recent studies which uphold that children learn language not by imitation but by constructing principles for the regularities that they hear. The process of 'creative construction' starts at a very early age in the play schools through auditory reception of rhymes highlighted by the right stresses, pauses and intonation. Thus the child's consciousness gets the initial imprint of the word order rule by the process of unconscious acquisition.

Finally the actions, gestures, sensory bonds accompanying the delivery of verses help the child to figure out some meaning in a fragmantary way whereby the pre-school children become cognitively engaged in cracking the code. Everything in the delivery of these rhymes steadily but surely leads the child from rhyme as mere play, rhythm and intonation to rhyme as grammar, meaning and subsequently to language as means of social communication.

In all societies adults use verse of some kind to young children and the children respond to it enthusiastically. According to Glenn and Cunningham (1983) there is evidence enough that children pay more attention to verse and rhymes that they do to other kinds of language. The play schools of the present century make a playful use of rhymes in abundance to woo young learners to the academic arena as well as to sow the seeds of 'creative construction.'

The sweeping exposure of children in early life to the kind of language used in rhymes emphasizing grammatical boundaries, stress, relevant actions and sensory contacts play a profound role in building up the pre-linguistic child psyche where the child starts figuring speech not as meaningless stream of sounds but as means of communication. It is in such pleasurable learning environment of play schools where the message that communication, the basic and ultimate business of language, is conveyed to the child.

REFERENCE :

1. Explorations in Applied Linguistics — H. G. Widdowson.
2. Language Play, Language Learning — Gay Cook.
3. Second Language Acquisition and Second Language Learning — S. Krashe.

Social Science

ধর্ম, সত্য ও নৈতিকতা - ভারতীয় কৃষ্টি ও মননে

ডঃ অদিতি ভট্টাচার্য
দর্শন বিভাগ

রাজমহিষী গান্ধারী উপস্থিত হয়েছেন রাজসমীপে — মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর করুণ আবেদন মহারাজ পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন, অধর্ম পথে চালিত পুত্রকে ত্যাগ করে ধর্মকে অবলম্বন করাই রাজকর্তব্য। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র মহিষীকে প্রশ্ন করেছেন 'কি দিবে তোমারে ধর্ম?' — গান্ধারীর উত্তর 'দুঃখ নব নব।'

প্রশ্ন জাগে মনে কি এই 'ধর্ম' যাকে পাথেয় করলে নতুন নতুন দুঃখকে বরণ করে নিতে হয়? 'ধর্ম' বলতে এখানে কি বোঝাতে চেয়েছেন গান্ধারী? এ প্রশ্নের মীমাংসা করার আগে বোঝা দরকার ভারতীয় কৃষ্টি ও মননে ঠিক কি ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য বহন করে 'ধর্ম' শব্দটি। নঞর্থকভাবে বলা যায় ইংরাজী 'religion' শব্দটি কোনোভাবেই এর প্রতিশব্দ নয় — অর্থাৎ 'religion' বলতে আমরা যা বুঝি 'ধর্ম' কোনো অর্থেই সেই তাৎপর্য বহন করে না। সাধরণতঃ 'religion' বলতে বোঝানো হয় কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচরণ বিধি পালন। ভারতবর্ষে 'ধর্ম' শব্দটি কিন্তু এরূপ একমাত্রিক সুনির্দ্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ নয় — এর ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক। শ্রী অরবিন্দ তাঁর 'The Foundations of Indian Culture' গ্রন্থের 'Religion and Spirituality' শীর্ষক অধ্যায়ে ভারতীয় কৃষ্টি ও মননে ধর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন "It gave itself no name, because it set itself no sectarian limits; it claimed no universal adhesion, asserted no sole infallible dogma, set up no single narrow path or gate of slavation, it was less a creed or cult than a continuously enlarging tradition of the godward endeavour of the human spirit. An immense many-sided and many-staged provision for a spiritual self-building and self-finding....." — অর্থাৎ কোনো সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা, কোনো ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া মতবাদ, মুক্তির কোনো সংকীর্ণ পথনির্দেশ অথবা একটিই মতকে সার্বিকভাবে মেনে চলার কঠোর দাবী — কোনোকিছুই ভারতীয় মননে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তাকে নির্দেশ করে না। ধর্ম হ'ল মানবাত্মার প্রসারণের পথে অভিসার — আধ্যাত্মিক আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মানুসন্ধানের জন্যে এক বহুমাত্রিক, বহু স্তরে বিন্যস্ত অনন্ত সম্ভাবনাময় পথপরিক্রমা।

'ধর্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'যা ধারণ করে থাকে' — অর্থাৎ যা লালন করে। এই অর্থটি খুব ব্যাপক, কিন্তু এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধর্মের যথার্থ তাৎপর্য। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মানুষের জীবনে ধর্ম কিভাবে চারটি মৌলিক প্রয়োজনকে চরিতার্থ করতে সাহায্য করে যা থেকে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে মানুষের

জীবনে ধর্ম হয়ে ওঠে প্রকৃত ধারক শক্তি। প্রথমতঃ, ধর্ম মানুষের মনে সঞ্চারিত করে দেয় এক উচ্চতম চেতনা বা অস্তিত্বে বিশ্বাস যা জগতের সবকিছুর অস্তিত্বের মূল এবং যা পূর্ণ, নিত্য ও অনন্ত। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে আত্মোন্নতির আস্পৃহা যার তাগিদে সে পরম অস্তিত্বের সত্যকে সচেতনভাবে নিজের মধ্যে পেতে চায়, তৃতীয়তঃ, ধর্ম মানুষকে দেয় একটি সুনির্দ্দিষ্ট চিরবিকাশমান জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পথের অনুসন্ধান। সর্ব্বশেষে, যে সকল মানুষ উচ্চতর পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হয় নি ধর্ম তাদের দেয় একই সাথে ব্যক্তিগত এবং ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগত বিধির নির্দ্দেশ যেগুলি পালনের মধ্যে দিয়ে মানুষ ক্রমশঃ তার নিজের সীমাকে অতিক্রম করে মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারে ও ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে বৃহত্তর অস্তিত্বের জন্য। ভারতবর্ষে ধর্মের এই সর্বশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে — ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত একটা বোধ যা প্রতিনিয়ত মানুষকে এক বৃহত্তর চেতনায় যুক্ত হতে সাহায্য করে, এটি হ'ল একটি সজীব আধ্যাত্মিক সত্য, একটি শক্তি, একটি উপস্থিতি যার অনুসন্ধান চলে জীবনভর — যাকে পাবার কোনো সুনির্দ্দিষ্ট একটাই পথ নেই — প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব প্রবৃত্তি, আবেগ ও রুচিঅনুযায়ী খুঁজে নেবে তার পথ আর সেকারণেই ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় পথে এত বিচিত্র ধারা। প্রতিটি ধারা, প্রতিটি পথ স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক — আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে সেই বৃহত্তর সত্যের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি।

ধর্মের এই বৃহত্তর ব্যঞ্জনা ভারতীয় কৃষ্টি ও মননে কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তা বোঝার জন্য ভারতীয় মহাকাব্য দুটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' 'ধর্ম' শব্দটি বারংবার উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিভিন্ন অর্থে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই ধর্ম সেখানে জড়িয়ে গেছে এক বৃহত্তর সত্যচেতনা ও নৈতিকবোধের সঙ্গে। এ দুটি মহাকাব্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটির দ্বারা কখনো বোঝানো হোয়েছে ন্যায়পরায়ণতাকে, কখনো বোঝানো হয়েছে সামাজিক বা কৌলিক প্রথাকে, কখনো ধর্ম নৈতিকতার সাথে এক হয়ে গেছে, কখনো বা এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে কর্তব্যকে, পূণ্যকে, আবার কখনো স্বধর্ম বা স্বভাবকে। এগুলির কোনোটাই কিন্তু এক অর্থ বহন করে না। ধর্মের এই বহুমাত্রিক প্রয়োগ একটা সত্যকেই নির্দেশিত করে — সেটা হ'ল এই যে মানুষের জীবনযাপনের বৈচিত্র্যময়তা, তার জীবনকে দেখা এবং জীবনের চূড়ান্ত সত্যগুলির মুখোমুখি হয়ে সেগুলোর সাথে যুক্ত হবার যে আর্তি তার সবকিছুর মধ্যেই একটা যোগসূত্র রচনা করে চলেছে এই ধর্ম।

আমাদের মহাকাব্য দুটিতে রয়েছে সনাতন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার। শ্রীরামচন্দ্র সনাতন ধর্মের ধারক, বাহক ও পালক। তিনি কূলধর্ম, রাজধর্ম ও লোকধর্মের রক্ষক। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার কারণেই তাঁকে বরণ করে নিতে হয়েছে যাবতীয় দুঃখ ও

যন্ত্রণাকে — পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বৎসর বনবাস পালনের মধ্যে দিয়ে যার শুরু ও যার পরিসমাপ্তি লোকধর্ম রক্ষার তাগিদে পত্নী সীতা এবং প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পরিত্যাগের মধ্যে দিয়ে। অন্যদিকে মহাভারতে দেখি কৌরবদের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে অধর্মের নাশ ও পান্ডবদের জয়ের মধ্যে দিয়ে ধর্মের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মহাকাব্যের কাহিনীর বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে মহাকাব্যকার শুধুই কি ধর্ম - অধর্ম অর্থাৎ সাদা কালোর বৈপরীত্যকেই তুলে ধরেছেন? মাঝে মাঝেই কি উন্মোচিত হয় নি বিচিত্র ঘটনা বা ক্রিয়া যাকে নিছক ধর্মানুষ্ঠান বা নিছক অধর্মানুষ্ঠানের মোটা দাগে চিহ্নিত করা যায় না? কখনো কখনো ধর্ম হয়ে ওঠে অধর্ম, কখনো বা অধর্ম পরিণত হয় ধর্মে — তখনই মনে হয় সাদা কলোর বাইরে একটা বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে যার বর্ণ ধূসর — যেখান ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম একাকার হয়ে যায়। ধর্মের প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'ধর্মস্য তত্ত্বম্ নিহিতম্ গুহ্যম্' — ধর্মের সত্য নিহিত রয়েছে অন্ধকার গুহার মধ্যে। একটা কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে ধর্মের বিচার চলে না — জীবনের পথে চলতে গিয়ে ব্যক্তি তার কর্ম, তার ব্যবহারিক বুদ্ধি, তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করতে থাকে ধর্মের নিহিতার্থ।

মহাকাব্যের কাহিনী বিস্তার বা ঘটনা বিন্যাসে দেখি ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিকে সম্মুখীন হতে হয়েছে এক তীব্র নৈতিক দ্বন্দ্বের। শ্রীরামচন্দ্র যখন সুগ্রীবের ভাই কিষ্কিন্ধারাজ বালিকে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে পিছন দিক থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করেন তখন তাঁর এই নিন্দনীয় ক্ষাত্রধর্মবিরোধী কাজের জন্য তাঁর মধ্যে কোনো নৈতিক দ্বন্দ্ব আমরা দেখি না। বরং তিনি তাঁর এরূপ কাজের সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি দেন — তাঁর সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ছিল পশুর ক্ষেত্রে ক্ষাত্রধর্মের প্রশ্ন তোলা হাস্যকর। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজা করে তার সাথে বন্ধুত্বকে স্থায়ী করার জন্যই বালিবধ করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁর বিবেকের কাছে পরিষ্কার যে অধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তিনি কোনো অন্যায় করেন নি। সেরূপ তস্করের মতো ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করে লক্ষ্মণ যখন নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে হত্যা করেন তখন তাঁরও মনে কোনো নৈতিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না — এক্ষেত্রে স্পষ্ট যুক্তি হ'ল অনার্য রাক্ষস সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আর্যধর্ম পালন নিষ্প্রয়োজন। আসলে রামায়ণে অনেক সোজা সরলভাবে ধর্মকে চিহ্নিত করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষায়। সেখানে নৈতিক দ্বন্দ্বকে উপস্থিত করা রামায়ণকারের উদ্দেশ্য নয় — তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল লোকধর্ম, রাজধর্ম, কূলধর্ম, এগুলিকে প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু মহাভারতে ধর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মহাভারতকার ব্যক্তির জীবনে নৈতিক দ্বন্দ্বকে সুনিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে অর্জুনের নৈতিক দ্বন্দ্বের কথা। চতুর্দিকে উপস্থিত প্রিয়জনদের দিকে তাকিয়ে মর্মবেদনায় ভেঙ্গে পরেন তিনি — ঘোষণা করেন যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়ে দেন অর্জুনকে তাঁর ক্ষাত্রধর্মের কথা — কিন্তু কোনোভাবেই

যখন তার দ্বারা অর্জুনের নৈতিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারলেন না তিনি, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মসাধনার উপদেশ দেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে দেন যে ধর্মরক্ষার জন্য তাঁকে কর্তব্যকর্ম করতে হবে। কর্ণপর্বে আমরা দেখতে পাই আবার একটি ভয়ঙ্কর রকম নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন অর্জুন — একদিকে সত্যরক্ষা অপরদিকে ভাতৃহত্যা এড়ানোর দায়বদ্ধতা। কর্ণের দ্বারা বিশ্রীভাবে অপমানিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে হয়েছিল — অর্জুন যখন সেই সংবাদ জানতে পেরে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে এসে যুধিষ্ঠিরের কুশল সংবাদ নিতে এলেন তখন যুধিষ্ঠির ক্রোধাক্রান্ত হয়ে অর্জুনকে বলেছিলেন অর্জুনের বীরত্বের যাবতীয় গর্বই হ'ল মিথ্যা গর্ব কারণ অর্জুনরে মতো বীর থাকতেও শত্রুপক্ষ এখনও অপারিজত, তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে অর্জুনের গান্ডীবধণুকেও অপমান করেছিলেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল কেউ যদি তাঁর গান্ডীবকে অপমান করে তাহলে তিনি তাকে হত্যা করবেন। ফলে তাঁর প্রতিজ্ঞারূপ সত্যরক্ষার জন্য এখন তাঁর যুধিষ্ঠিরকে বধ করা ছাড়া উপায় নেই। এরূপ নৈতিক দ্বন্দ্বের সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুন যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে একটি কাহিনী শোনালেন। কৌশিক নামে এক সাধু ছিলেন যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি সর্বদা সত্য কথা বলবেন। একদিন কৌশিক এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন — একদল ডাকাত কিছু নিরীহ পথিকদের অনুসরণ করেছিল তাদের বধ করার উদ্দেশ্যে। কৌশিক যে স্থানে বসে ধ্যান করছিলেন সেই স্থান দিয়ে প্রাণভয়ে ভীত পথিকরা পলায়ন করছিলেন। তাঁরা কৌশিককে অনুরোধ করলেন তিনি যেন কোনভাবেই তাঁরা যে পথে যাচ্ছেন সে পথের নির্দেশ ডাকাতদের না দেন। কৌশিক তাঁদের কথার কোনো উত্তর দিলেন না। শীঘ্রই ডাকাতের দল এসে পড়ল এবং যথারীতি কৌশিককে জিজ্ঞেস করল পথিকদের কথা। কৌশিক তাদের সত্যকথাই বললেন, ফলে নিরীহ পথিকদের মৃত্যু হ'ল। এই কাহিনীটা বলে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন মৃত্যুর পর কৌশিককে নরকে যেতে হয়েছিল তাঁর নিষ্ঠুর কর্মের কারণে। যদিও তিনি সারাজীবন সত্যকথনের নীতি মেনে চলেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর এই সত্যকথন তাঁর কাঙ্খিত স্বর্গলাভের সহায়ক হ'ল না, কারণ এমন পরিস্থিতি আসতেই পারে যখন বৃহত্তর কোনো কর্তব্যের জন্য সত্যপালনের কর্তব্য থেকে বিরত হতে হয় — এক্ষেত্রে সেই কর্তব্য হ'ল নিষ্পাপ জীবনকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব। সত্যরক্ষা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে অন্যতম মহৎ পূণ্যকর্ম বলে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু কখনো কখনো বৃহত্তর স্বার্থে অনৃতভাষণ শুধু ক্ষমাই নয়, সেটাই ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণের এই কাহিনী শুনে অর্জুন শান্ত হলেন এবং উপলব্ধি করলেন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার ধর্মের তুলনায় বৃহত্তর ধর্ম হ'ল জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাণরক্ষা করা।

ধর্মের নীতি শাশ্বত যা সর্বকালে, সর্বাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য, অথচ ভারতীয় চিন্তায় কখনো কখনো পরিস্থিতিভেদে ধর্মের ব্যাখ্যার পরিবর্তন গৃহীত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরম ধার্মিক সদা সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের অনৃতভাষণ এরকমই এক ঘটনা। অপরাজেয় দ্রোণাচার্যের হাতে যখন পান্ডবসেনারা বিপর্যস্ত, ছত্রাকার, সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের

অনুরোধে দ্বিধাগ্রস্থ যুধিষ্ঠির উপায়ান্তর না দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে তাঁর প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর মিথ্যা সমাচার দিলেন। এর ফলে দ্রোণাচার্য অস্ত্রত্যাগ করলেন, আর অর্জুনের হাতে তাঁর মৃত্যু হ'ল। যুধিষ্ঠিরের এই অপরাধ যে কতখানি কঠিন অপরাধ তার প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি এই অনৃতভাষণের শাস্তিস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের রথ, যা কখনো ভূমিস্পর্শ করতো না, তা এরপর থেকে ভূমিস্পর্শ করলো এবং যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুর পর তাঁকে একবারের জন্য হলেও নরক দর্শন করতে হয়েছিল। দ্রোণাচার্য অস্ত্রত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে আদেশ করলেন তাঁকে হত্যা করতে তখন অর্জুনের দ্বিধা দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কিভাবে যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে সপ্তরথী সেনা একাকী অভিমুন্যকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন এবং সেই হত্যার সিংহভাগ দায়িত্ব ছিল দ্রোণাচার্যেরই কারণ তাঁরই একমাত্র জানা ছিল যে অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করার কৌশল জানেন কিন্তু চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল তাঁর আয়ত্তে নেই। একথা শোনার পর অর্জুন তাঁর যাবতীয় দ্বিধা কাটিয়ে দ্রোণবধ করেন। দ্রোণবধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের যে নৈতিক দ্বন্দ্ব তা তাঁদের ধর্মবোধের পরিচায়ক, তবে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতে আমরা কিন্তু অনুভব করি না যে ধর্মের নীতি ভীষণভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে কারণ মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষায় দ্রোণাচার্যকে কখনোই একজন ধার্মিক ব্যক্তিরূপে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বালক অভিমন্যুকে বধ করার ব্যাপারে দ্রোণাচার্যের ভূমিকা ও তার মৃত্যুতে দ্রোণের নিষ্ঠুর উল্লাস আমাদের ব্যথিত করে। অনুরূপভাবে আমরা ব্যথিত হই যখন আমরা একলব্যের প্রতি দ্রোণের আচরণকে স্মরণ করি। জাত্যাভিমান বশতঃ নিষাদ বালক একলব্যকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন নি দ্রোণ। একলব্য মনে মনে দ্রোণাচার্যকে গুরু হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর মূর্তিকে সামনে রেখে একাগ্র সাধনায় হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ দক্ষ ধনুর্ধর। প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে একদিন দক্ষতায় একলব্য অতিক্রম করে যেতে পারেন এই আশঙ্কায় দ্রোণাচার্য নির্দ্বিধায় একলব্যের কাছ থেকে এক অদ্ভুত গুরুদক্ষিণা দাবী করে বসলেন — একলব্যের কাছে তিনি চাইলেন তাঁর ডানহাতের তর্জনীটি — একথা জেনেই যে এরপর একলব্যের পক্ষে আর ঐ দক্ষতায় তীর নিক্ষেপ করা সম্ভব হবে না। একলব্য সব বুঝেও গুরুর দাবী মেনে নিয়ে গুরুদক্ষিণা দিলেন। দ্রোণাচার্যের এই আচরণ যে কতটা হীন এবং অধর্মজনোচিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অভিমন্যু এবং একলব্যের প্রতি দ্রোণাচার্যের এই ক্ষমাহীন আচরণ তাঁর অন্য সমস্ত প্রকার গুণকেই আবৃত করে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠিরের অনৃতভাষণ এবং অর্জুনের নিরস্ত্র গুরুকে বধ কোনোটাই যেন আর অধর্ম বলে আমাদের মনে হয় না। এভাবেই মহাভারতকার ধর্ম আর অধর্মের বুননে আমাদের ধন্দে ফেলে দেন — মনে প্রশ্ন জাগে কোন্‌টা যথার্থ ধর্ম, কোন্‌টা অধর্ম। মনে হয় মহাভারতকার যেন সাধারণ বিচারে যা ধর্ম বা অধর্ম তাকে অতিক্রম করে কোনো এক বৃহত্তর ধর্মের দিকে ইঙ্গিতে করতে চান। একই সাথে আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্যক্তি তার শুভবোধ এবং নৈতিক বিচারক্ষমতার প্রয়োগ করে নিদ্ধারণ করে নেবে কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্‌টা যথার্থ ধর্ম এবং এখানেই প্রশ্ন উঠবে তার দায়বদ্ধতার।

ব্যক্তির শুভবোধ ও নৈতিক বিচার ক্ষমতা এবং সেই প্রসঙ্গে তার দায়বদ্ধতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হ'ল ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত মহর্ষি গৌতম ও সত্যকামের কাহিনী। জননী জবালার স্নেহচ্ছায়ায় পালিত সত্যকাম গিয়েছিলেন মহর্ষি গৌতমের কাছে তাঁকে শিক্ষাগুরু করবার অভিপ্রায় নিয়ে। তাঁকে দীক্ষিত করার পূর্বে তখনকার রীতি অনুযায়ী গৌতম তাঁর পিতৃপরিচয় আর গোত্র জানতে চাইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সত্যকাম তাঁর পিতার নাম বা গোত্র কিছুই জানতেন না। তিনি বললেন যে তিনি মাতার কাছ থেকে জেনে এসে বলবেন। মাতার কাছে নিজের পিতৃপরিচয় জানতে এসে সত্যকাম শুনলেন যে, কে তাঁর পিতা তা তাঁর মাতা জানেন না কারণ নিজের দেহ পণ্য করে একসময় তাঁর মাতাকে জীবনধারণ করতে হয়েছে আর তারই ফলস্বরূপ সত্যকামের জন্ম। এই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হয়ে সত্যকাম কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। পরদিন গুরুগৃহে এসে অন্যান্য শিষ্যদের সম্মুখেই তিনি গুরুর কাছে নিবেদন করলেন নিজের জন্মবৃত্তান্ত। তরুণ শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে বিদ্রূপের হাসি হাসলো, কিন্তু গৌতম উঠে দাঁড়ালেন — আলিঙ্গন করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সত্যকামকে — সত্যকামের দৃঢ়তা, সাহস ও সত্যবাদীতা তাঁকে মুগ্ধ করল। সংকীর্ণ লোকধর্মের উর্দ্ধে উঠে সত্যকামকে তিনি বরণ করলেন শিষ্যত্বে — মাতার নামে সত্যকামের গোত্রের নামকরণ করলেন — জবালা সত্যকাম। সকল প্রকার প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মবোধের উর্দ্ধে উঠে যে সিদ্ধান্ত গৌতম নিলেন অস্তিবাদী দর্শনের ভাষায় সেটা হ'ল যথার্থ অর্থে নৈতিক সিদ্ধান্ত — এই সিদ্ধান্ত যিনি নিলেন তিনি কোনভাবেই কোনো নির্দিষ্ট বিধি নিষেধের দ্বারা চালিত হ'ন নি — তাঁর এজাতীয় সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র তাঁর শুভবোধ এবং নৈতিক চেতনা প্রসূত।

ধর্মের প্রশ্নে, নৈতিকতার প্রশ্নে যখনই ব্যক্তির দায়বদ্ধতার প্রশ্ন ওঠে তখনই বোঝা যায় কেন গান্ধারী ধর্মকে বরণ করে নেবার মধ্যে দিয়ে 'নব নব দুঃখকে' বরণ করে নেবার কথা বলেছেন। মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে এই বিষয়টা বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। নিজে কখনো সিংহাসনে বসবেন না অথচ কুরুবংশের মর্যাদা আজীবন রক্ষা করে চলবেন এই যে প্রতিজ্ঞা ভীষ্ম করেছিলেন পিতা শান্তনুর কাছে, সেই প্রতিজ্ঞার দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে গিয়ে সারাজীবন বহু যন্ত্রনা ও দুঃখভোগকে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি। পিতৃসত্য রক্ষার দায়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে একাকীত্বকে মেনে নিয়েছেন, কুরুবংশের মর্যাদা, সর্বোপরি ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য বারবার ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়েছেন আর ব্যর্থ হয়ে ব্যাথায় দীর্ণ হয়েছেন, সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন নি, পারেন নি অকৃতজ্ঞ হতে তাই মনেপ্রাণে পান্ডবদের সমর্থন করেও শেষ পর্য্যন্ত কৌরবদের হয়েই অস্ত্রধারণ করেছেন। এখানেই শেষ হয় নি তাঁর যন্ত্রণা — কৌরবদের হয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেও তাঁকে শুনতে হয়েছে দুর্যোধনের গঞ্জনা যে তিনি মন দিয়ে যুদ্ধ করছেন না। ঠিক এরকমই আরেকজন ব্যক্তিত্ব মহামতি বিদু'র। মহাভারতে বিদুরের উপস্থিতি ভীষ্মর মত তীব্র নয়, কিন্তু তাঁর নীরব অথচ অনিবার্য উপস্থিতি দিয়ে তিনি আমাদের মনকে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অধিকার করে থাকেন।

সারাজীবন ধর্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি — মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নানা ধর্মোপদেশ শুনিয়েছেন — তাঁকে নিরস্ত করতে চেয়েছেন দুর্যোধনের সমস্ত রকম পাপ কর্মের সামিল হওয়া থেকে। কিন্তু বিদুরের অনুরোধ রক্ষা করার মতো দৃঢ়তা ও সততা কোনোটাই ধৃতরাষ্ট্রের ছিল না, তাই বিদুরকে নিরন্তর যন্ত্রনাই পেতে হয়েছে। ধর্মকে বরণ করে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রনায় যিনি প্রতিনিয়ত দীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তিনি হলেন রাজমহিষী গান্ধারী। গান্ধারীর ধর্ম কোনো সংকীর্ণ ধর্ম নয় — এ হ'ল এক বৃহত্তর মানবধর্ম যাকে না স্বীকৃতি দিলে জীবনের সমস্ত অর্থ আর তাৎপর্য যায় হারিয়ে। স্বামীর সাথে একাত্মতা লাভের প্রয়াসে যে নারী বধূজীবনের প্রথম দিন থেকে নিজের হাতে চোখ বেঁধে নিয়েছেন, সেই নারী যখন বারংবার প্রয়াসেও তাঁর স্বামীকে বোঝাতে পারেন না যে কী অধর্ম তিনি প্রতিমুহূর্তে করে চলেছেন অধর্মচারী পুত্রের প্রতি অন্ধ স্নেহ বশতঃ, তখন নারী হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা বুঝতে আমাদের এতটুকু কষ্ট হয় না। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে মা — তাঁর রক্তমাংস, আনন্দ বেদনা দিয়ে গড়া যে সন্তান সেই সন্তান যখন কুপথে যায় তখন তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে না পারার যে অপরিসীম যন্ত্রণা তাঁকে প্রতিনিয়ত বহন করে চলতে হয় তা আমাদের হৃদয়কে বেদনায় স্তব্ধ করে দেয়; কষ্টে বুক ফেটে গেলেও তিনি কখনো ধর্মের পথ ত্যাগ করেন না — পঞ্চপান্ডব যখন যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁর কাছে আশীর্বাদ নিতে যান তখন তিনি নির্দ্বিধায় তাঁদের বলেন 'জয়ী হও'। পুত্র দুর্যোধন যখন মাতার কাছে উপস্থিত হ'ন আশীর্বাদ গ্রহণ করতে তখন তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করেন কিন্তু জয়ী হবার কথা উচ্চারণ করেন না কারণ তিনি জানেন ধর্মেরই জয় সুনিশ্চিত। একদিকে তাঁর মাতৃহৃদয় প্রার্থনা করেছে পুত্র যেন জয়ী হয়, অপরদিকে তেজস্বিনী ধর্মপরায়ণা নারী হিসাবে তিনি ধর্মের জয় চেয়েছেন — এ এক সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব।

মহাভারতে বর্ণিত চরিত্রগুলির এই নিরন্তর নৈতিক দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা তাঁদেরকে অনেক বেশি আমাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। একদিকে শাশ্বত ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ, সত্যরক্ষার আকূতি, অপরদিকে ব্যবহারিক নানা আচরণে তার থেকে প্রতি মুহূর্তে স্খলন ও উত্তরণের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে ঐ চরিত্রগুলি একান্তভাবে আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ — এই বোধ আমাদের হয়। আর এই সময় আমরা নতুন করে উপলব্ধি করি কান্টীয় নীতিদর্শনের কঠিন কঠোর নৈতিকতার তুলনায় ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতার ব্যঞ্জনা অনেক বেশি মানবিক ও বাস্তবমুখী। জার্মান দার্শনিক কান্ট তাঁর নীতিদর্শনে যখন সার্বিক নৈতিক নিয়মের (Universal moral law) কথা বলেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে এটাই বলতে চান যে এই জাতীয় সার্বিক নিয়মগুলি সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য — পরিস্থিতিভেদে বা ব্যক্তির স্বধর্মভেদে এই জাতীয় নৈতিক নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম কোনোভাবেই গ্রহণীয় নয়। সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল ব্যক্তির জন্য একই নিয়ম সমানভাবে প্রযোজ্য এবং এর লঙ্ঘন করা হ'ল নৈতিক অপরাধ ও সত্যধর্ম পালন থেকে বিচ্যুতি, ভারতীয় চিন্তায় এ জাতীয় সার্বিক কঠোর নৈতিক নিয়মের স্থান নেই। কিছু নৈতিক নিয়মের কথা স্বীকার করা হয়েছে — যেমন, সত্যরক্ষা, কুলধর্ম,

বর্ণধর্ম রক্ষা করা, অপরের ধন অপহরণ না করা, নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা না করা ইত্যাদি। কিন্তু এই নৈতিক নিয়মগুলি সমস্ত পরিস্থিতিতেই অলঙ্ঘনীয় একথা ভারতীয় মননে স্বীকৃতি পায় নি। ব্যক্তির স্বধর্ম, পরিস্থিতি ভেদে নৈতিক দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় নৈতিকতা ও ধর্মবোধ বাস্তবতাকে অনেক বেশি স্পর্শ করেছে।

শুধু তাই নয়, কান্টীয় নীতিদর্শনে কর্তব্যের জন্য কর্তব্যপালনের (duty for duty's sake) কথা বলা হয়েছে — সেখানে স্নেহমমতা, সহানুভূতি ইত্যাদি ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির কোনো স্থান নেই — মমতাবশতঃ নয়, শুধুমাত্র নিছক কর্তব্যবোধ থেকেই নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে এটাই কান্টের মূল্য বক্তব্য। নৈতিক কর্তব্যের সঙ্গে সহানুভূতি, স্নেহ মমতা ইত্যাদি যুক্ত হলে তা কোনো কাজের নৈতিক মূল্যকে কোনোভাবেই বর্ধিত করে না। ভারতীয় চিন্তায় কিন্তু ঠিক এর বিপরীত কথা সত্যি। ধর্মপালন ও সত্যরক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় ব্যক্তিকে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোনো এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে যখন ব্যক্তি বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'ন, যন্ত্রনায় বিদ্ধ হ'ন তখন সেই নৈতিক সিদ্ধান্ত যেন অনেক বেশি মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। 'দন্ডিতের সাথে দন্ডদাতা কাঁছে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার' — রাজধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে প্রিয়পত্নী সীতাকে বনবাসে পাঠাতে হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রকে বেদনাতুর হৃদয়ে; সত্যরক্ষা করার জন্য প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করতে গিয়ে যন্ত্রণায় দীর্ণ হতে হয়েছে তাঁকে। নীতিধর্মে অনড় থেকেও এই যে যন্ত্রণাবোধ এতেই তো ধর্ম মানবধর্মে পরিণত হয়। অধর্মচারী পুত্রকে ত্যাগ করার জন্য স্বামীকে অনুরোধ জানাতে গিয়ে গান্ধারীর যে বেদনা তা কোমল মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন বেদনা — তাকে কি কোনোভাবে উপেক্ষা করা যায়? নীতিধর্ম পালন করতে গিয়ে বেদনাতুর হৃদয়ের এই যে ক্ষরণ তা মনে করিয়ে দেয় অস্তিবাদী নীতিদর্শনে বারংবার উচ্চারিত 'Passionate Commitment' এর কথা। নৈতিক দায়বদ্ধতা তখনই সত্য হয়ে ওঠে যখন তা হয় তীব্র আবেগ ও অনুভূতির মন্থন থেকে উঠে আসা নির্যাস। জীবনের এই চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে বলেই ভারতীয় মননে ও চিন্তনে ধর্ম, নৈতিকতা ও সত্যবোধ এত জীবন্ত, এত মর্মস্পর্শী ও এত বাস্তব হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র নৈতিক বোধের কঠোর সংকীর্ণ নিগড়ে আবদ্ধ না থেকে তা বিস্তৃতি লাভ করেছে, হয়ে উঠেছে সত্যকার মানবধর্ম।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। The Foundations of Indian Culture, Sri Aurobindo.
২। The Collected Essays of Bimal Krishna Matilal Ethics and Epics. Edited by Jonardon Ganeri.

পণ্যভোগবাদ

ড. সুজয় ঘোষ,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ইংরাজীতে যে শব্দটি consumerism বলে পরিচিত, বাংলায় সেই শব্দটিকে আমি 'পণ্যভোগবাদ' বলে ব্যবহার করতে চাইছি। সঠিক শব্দানুবাদ করলে শব্দটি দাঁড়ায় 'ভোগবাদ' ঃ consume করার অর্থ ভোগ করা। কিন্তু ভোগবাদ শব্দটি বাংলায় বহুল প্রচলিত এবং consumerism এর সামগ্রিক ধারণা সেখানে ফুটে ওঠেনা, সেহেতু ভাবানুবাদই শ্রেয়ঃ। পণ্যভোগবাদ শব্দটিতে consumerism এর সামগ্রিক ধারণাটার হদিশ করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে আমরা দুই প্রকার ভোগ্যপণ্য দেখতে পাই ঃ বস্তুগত (material) - যেগুলি আমরা প্রধানতঃ শারীরিকভাবে উপভোগ করি যথা সুখাদ্য পানীয় অথবা পরিধেয় বিষয়। দ্বিতীয় প্রকার পণ্য হোল অ-বস্তুগত (non-material) বা সাংস্কৃতিক (cultural), যেগুলি আমরা মানসিকস্তরে উপভোগ করে থাকি। এইগুলির গণ্ডী অবশ্যই কঠোরভাবে সীমায়িত নয়, বরং যথেষ্ট নমনীয়। সুখাদ্য গ্রহণের আনন্দ বা সুন্দর পোষাক পরিধানের আনন্দ মানুষের মানসিক বা ভাবগত স্তরে প্রতিফলিত হয়। আবার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পণ্য, যথা সংগীত, চলচ্চিত্র ইত্যাদি আস্বাদনের জন্য বস্তুগত আধার, যথা সঙ্গীতযন্ত্র, বেতারযন্ত্র বা দূরদর্শনের প্রয়োজন হয়।

এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হোল মানুষের সামগ্রিক সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যভোগবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। প্রথমতঃ, আমাদের পণ্যভোগবাদকে বর্ত্তমান সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করতে হবে। তারপর আমাদের সেসব উপায়ের সন্ধান করতে হবে, যার দ্বারা পণ্যভোগবাদকে মানুষের প্রয়োজনের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পণ্যভোগবাদের প্রকৃতি ঃ

বস্তুগত অথবা সাংস্কৃতিক — যে কোনও ধরণের পণ্যই হোক না কেন, ভোগ করার জন্যই তাকে সৃজন করা হয়েছে। যদি ভোগ না করা হয়, তাহলে পণ্যের কোনও অর্থ হয় না। বর্ত্তমানকালে বাজার অর্থনীতির যুগে মানবসভ্যতা একটি অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করেছে এবং মানুষের চাহিদা পরিমানগত এবং গুণগত — উভয় মাত্রাতেই ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ অবশ্যই হোল জনসংখ্যার বৃদ্ধি। বিগত দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। এর ফলে একদিকে মানুষের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হয়েছে, অন্যদিকে মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে

কমে গেছে। এই বর্ধিত জনসংখ্যার আশা আকাঙ্খার পরিমাণও গাণিতিক নিয়মে বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলেই চায় বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্তগুলির নিরাপত্তা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান। একই সঙ্গে সভ্যভাবে জীবনযাপন করার অর্থ হোল মানুষের মত বেঁচে থাকা, যেখানে অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি নিজের বৌদ্ধিক সত্তা, চেতনা ইত্যাদি উপভোগ করার আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। একই সঙ্গে কালের নিয়ম অনুসারে মানুষের অভিজ্ঞতার ভান্ডার স্ফীত হতে থাকে ঃ গতকালের ভুলটা সে আজকে করতে চায় না, গতকালের দুর্ভোগ আজকে ভুগতে চায় না এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের তুলনায় অনেক আরামপ্রদ, নির্ঝঞ্ঝাট ও নিরাপদ করতে চায়। সবসময় হয়তো মানুষ সে ব্যাপারে সফল হয় না, কিন্তু সেটা একটা স্বতন্ত্র বিষয়।

পণভোগবাদকে বর্ত্তমানকালের জটিল সভ্যতার পটভূমিকায় বিচার করতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে মানুষের জন্ম বা বংশপরিচয় তার সামাজিক মর্যাদা নিয়ন্ত্রণ করত এবং ভোগ্যপণ্যের বন্টনও সেই অনুসারে নির্ধারিত হত। মানুষের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী স্থির হত কে কোন পণ্য ভোগ করবে — ভোগ্যপণ্য মানুষের গৌরবের প্রতীক ছিল এবং বংশকৌলিন্য ছিল তার মাপকাঠি। অবশ্য এ যুগেও ভোগ্যপণ্য মানুষের গৌরবের প্রতীক — তবে, মাপকাঠি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ধনতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে অর্থই দুনিয়া শাসন করে — অর্থের দ্বারা সমাজে মানুষের স্থান নির্ধারণ করা হয়। কেউ ভোগ করতে পারবেন কিনা, পারলে কোন জিনিষ কতটা ভোগ করবেন সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয় সমূহ হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক নয়, তবে চূড়ান্ত নির্নায়ক অবশ্যই হোল অর্থ।

একই সঙ্গে, ভোগ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়েছে। মানুষ মনে করে যে সভ্যতার বিকাশে তার অংশীদার হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। বস্তুত, বর্ত্তমানে সভ্যজীবনের একটি অন্যতম মাপকাঠি হোল বস্তুগত এবং সংস্কৃতিগতভাবে মানবজীবনের অগ্রগতির উত্তরাধিকার লাভ করা। অন্যকথায়,

> ..... goods consumed or services enjoyed towards a qualitative assessment of life as a whole in terms of the essential elements in civilization or culture (Marshall, 1977:76)

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বহুমানুষের জীবনযাত্রা এই মাপকাঠি থেকে অনেক দূরে। কিন্তু সেসব মানুষেরা একথা বোঝেন যে তাদের সুন্দরভাবে জীবন কাটানো সম্ভব। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে অধিকাংশ হানাহানির মূলে আছে সুন্দরতর জীবন লাভ করার ইচ্ছা অথবা সেই জীবন থেকে বঞ্চিত হবার জন্য সৃষ্ট ক্রোধ ও হতাশা।

মানুষের আশা আকাঙ্খার বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য বর্ত্তমান সভ্যতাকে জটিল থেকে

জটিলতর করে তুলেছে এবং এগুলির মূলে রয়েছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি। এই পরিস্থিতিতে পণ্যভোগবাদ সুন্দরভাবে মানিয়ে যায়। অধিকমাত্রায়, বিপুল পরিমানে উৎপাদন করার অর্থ হল উৎপাদন এবং বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু মানুষের কর্মসংস্থান। সেই মানুষগুলি আবার উপার্জিত অর্থ বিভিন্ন রকম পণ্য ক্রয় করার জন্য ব্যয় করবেন। এইভাবে পণ্যভোগবাদ বাজার অর্থনীতির একটি প্রধান শর্ত পালন করে — একটি সমাজে যত বেশি অর্থের সঞ্চালন এবং স্বাচ্ছ্যবান থাকে। শুধুমাত্র একটি পণ্যকে কেন্দ্র করে আমরা বাজারের ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। দূরদর্শন যন্ত্রটি নির্মাণ, ব্যবহার ও বিপণন করার জন্য বহু প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হয়। এই সব কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বহু প্রশিক্ষক এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়। সেগুলিকে কেন্দ্র করে বাজার গড়ে ওঠে। আবার যন্ত্রটি বিপণন করার জন্য সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য বিপণন কেন্দ্রের উদ্ভব হয়, এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সর্বশেষে দূরদর্শনে শতাধিক চ্যানেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ভূমিকায় — নায়ক থেকে টেকনিশিয়ান কয়েক লক্ষ মানুষ জড়িয়ে থাকেন এবং বহুলাংশেই তাঁদের জীবিকা এর উপর নির্ভর করে। একই সঙ্গে, অসংখ্য বিজ্ঞাপনে বহু মানুষ জড়িত থাকেন, এবং নানা রকম পণ্য নানাভাবে অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস চলে। অর্থাৎ বাজার থেকে যে অর্থ উঠে আসে, বাজারেই সেটা আবার ফিরে যায়। মাঝখানে থাকে একটি বিশাল পর্ব — পণ্য কে ভোগ করা।

ধনতান্ত্রিক বাজার ভিত্তিক অর্থনীতি মানুষের ভোগ করার প্রবণতাকে নানাভাবে উৎসাহ দেয়। মানুষের চাহিদার এলাকাগুলি তারা খুঁজে বার করে, কখনও কখনও তারা নতুন চাহিদার সৃজন করে। যেমন digital camera বাজারে আসার পর একটু একটু করে মানুষ প্রচলিত camera গুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ, কড়িটুকু ফেলার অপেক্ষা মাত্র — চাহিদা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পণ্য হাজির। কখনও কখনও, চাহিদা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটি পণ্যের সঙ্গে অন্যান্য পণ্যও প্রস্তুত হয়ে থাকে, এবং বিজ্ঞাপন পণ্যকে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রধানতম মাধ্যম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সফলভাবে এই কাজ করেছে। নব্বই-এর দশকের শুরুতে যখন আমাদের দেশে উপগ্রহ চ্যানেলের প্রথম আগমন হোল, একটি ক্রীড়া চ্যানেল তখন তাদের অনুষ্ঠান সূচীর বিজ্ঞাপন দিয়েছিল : 'cricket, cricket and more cricket' একই সঙ্গে অপর একটি বিজ্ঞাপন বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল : ' Eat cricket, sleep cricket, drink only Coca Cola'। আমাদের দেশে অনেকের পক্ষেই খেলা দেখার জন্য ব্যয় করা সম্ভব কিনা, পানীয় জল সকলের হাতের কাছে থাকে কিনা, সেসব প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্র।

পণ্যভোগবাদ মানুষের মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিকগুলিকে আর্থিক লেনদেনের ছকে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সেগুলি যে সবসময় খারাপ সেকথা

অবশ্য বলা যায় না। একটি বীমা সংস্থা তাদের বিশেষ কোনও scheme এর বিজ্ঞাপনে দেখিয়েছিল যে একজন তরুণ পিতা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে তাঁর শিশুকন্যার পরিচর্যা করছেন। কয়েক বছর পর যখন বয়স তাঁর চেহারায় ছাপ ফেলতে শুরু করেছে, তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে বিশ্রাম করছেন এবং এখন বড় হয়ে যাওয়া সেই কন্যাটি একই রকম ভাবে তাঁকে সেবা করছে। দর্শকদের অনেকে হয়তো সেই বীমা গ্রহণ করবেন, আবার অনেকে করবেন না, কিন্তু মানুষের অনুভূতির একটি গভীরতম স্থানে আলোকপাত করে বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয়ই বহু পিতার হৃদয়ে অমৃতক্ষরণ করেছে।

মানুষের ভোগ করার পরিধি যতদূর প্রসারিত হবে, পণ্যের বাজারও ততদূর বিস্তৃত হবে। সেই উদ্দেশ্যে পণ্যভোগবাদ মানুষের বিভিন্ন রিপুগুলিকে উসকে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ মানুষের আলস্যরিপুকে তুষ্ট করার জন্য বাজারে বিভিন্ন পণ্য হাজির থাকে। নিয়মিত শরীর চর্চায় অনিচ্ছুক, কিন্তু সাধারণভাবে স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তির সেবার Morning Walker জাতীয় পণ্য বাজারে উপস্থিত আছে। আবার, আমরা কেউ কি ভয় পেতে ভালবাসি অথবা ভয়কে উপভোগ করি? পণ্যভোগবাদ প্রমাণ করেছে যে উত্তরটা ইতিবাচক হওয়া সম্ভব। প্রায় দেড় দশক আগে Exorcis - 3 নামে একটি সিনেমা ভারতীয় বাজারে আসে। প্রথম সংস্করণটি ১৯৭০ এর দশকে মুক্তি পেয়েছিল। যাই হোক, এই সংখ্যাটির বিজ্ঞাপনে হাড় হিম করে দেওয়া একটি মুখকে দেখান হয়েছে, এবং যেন তার মুখ দিয়ে সিনেমাটি দাবি করছে যে তাদের প্রথম আবির্ভাবেই তারা 'ভয়' শব্দটির অর্থ পাল্টে ফেলেছিল। তারা আবার এসেছে, এবং দর্শকদের যদি সাহস থাকে, তাহলেই তারা যেন আবার এই সংস্করণটি দেখতে আসে : 'Return, if you dare.' সিনেমা দেখতে এসে বন্ধুবান্ধবীদের সামনে কে প্রমাণ করতে চাইবে যে সে ভয় পেয়েছে?

কখনও কখনও পণ্যভোগবাদ, বিশেষতঃ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অত্যন্ত অশ্লীলরূপে প্রকট হয়। অশ্লীলতা বলতে সাধারণভাবে সেইসব কথাবার্তা বা আচরণকে বলা যায় যেগুলি মানুষের সহজাত শালীনতাবোধ, রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ এবং সর্বোপরি মানবতাবোধকে আঘাত করে। মানুষের কাম রিপুকে পণ্যভোগবাদ কিভাবে প্রশ্রয় দেয় সেকথা সকলেই জানেন। শুধু একথা বলতে হয় যে দু'দশক আগে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন যথেষ্ট অশালীন মনে করা হত, তা যেন অনেকটাই গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। বরং এখন এমনসব বিজ্ঞাপন দেখান হচ্ছে যা রীতিমত বিস্ময়কর — কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সেগুলি ভাবা যেত না। আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রাটা কিছুটা বেশিই হবে, কারণ পশ্চিমী ধাঁচের পণ্যভোগে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলেও এখনও আমরা পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা থেকে বহুলাংশেই মুক্ত হতে পারি নি এবং মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে শিখি নি। পণ্যভোগবাদ আমাদের দেশে নারীকে অনেকক্ষেত্রেই একটি পণ্য হিসাবে

উপস্থাপিত করে। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি যে ইদানীংকালে নারীঘটিত অপরাধ অনেক বেড়েছে এবং সামাজিক প্রতিরোধও অনেক কমে গেছে। কোথাও যেন অবচেতন মনে নারীকেই দোষী মনে করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। অর্থাৎ পণ্যভোগবাদ সামাজিক নিষ্ক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং এইভাবে একটি জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যাকে চাপা দিয়ে রাখছে।

শুধুমাত্র যৌন সুড়সুড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য রিপুর ক্ষেত্রেও পণ্যভোগবাদ অশ্লীলতার পরিচয় মাঝে মাঝেই দিয়েছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। প্রায় একদশক আগে একটি গুঁড়ো সাবানের বিজ্ঞাপনে একজন ভদ্রমহিলাকে দেখান হয়েছিল, যিনি Washing Machine-এর অকার্যকারিতায় বিরক্ত হয়ে সেটিকে তাঁর বহুতল আবাসন থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন। পরিবর্তে তিনি সেই গুঁড়ো সাবানটি ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, সমগ্র সিদ্ধান্তটি নিতে তিনি কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়েছিলেন। কয়েকটি প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে। Washing Machine-এর মত একটি ভারী বস্তুকে নীচে ফেলে দেওয়া কিরকম সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয়? কোন ধরণের ক্রেতাদের কাছে পণ্যটি পৌঁছতে চাইছে? কিরকম আচরণের তারা জয়গান করছে? যে দেশে বহু মানুষ এখনও অর্ধাহার ও অনাহারে দিন কাটান, আরও অনেক সংখ্যক মানুষ খোলা আকাশের নীচে রাত কাটান — তাঁদের অনেকেই হয়তো সেরকম বহুতলের পার্শ্ববর্ত্তী ফুটপাথে থাকেন, সেখানে এই ধরণের অপচয়কে গৌরবান্বিত করা অত্যন্ত অশ্লীলতার পরিচয়। আরও একটি কথা : Washing Machine একটি মূল্যবান গৃহস্থালী সরঞ্জাম — মানুষ সেটিকে রক্ষা করে। কাজেই কেউ সেটাকে এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ভেঙে ফেললে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি উঠে আসে সেটি হোল : তাঁর কষ্টের দ্বারা সৎভাবে উপার্জিত অর্থে সরঞ্জামটি কেনা হয়েছিল তো? নাকি, সেসব প্রশ্ন অবান্তর — পণ্যটা বাজারে বিক্রি হলেই হোল। উল্লেখ্য, সেই গুঁড়ো সাবানটাকে এখন আর বাজারে দেখা যায় না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি — যেগুলিকে ঘোষিতভাবেই জনগণের সেবা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেগুলিও বাজারে প্রবেশ করার জন্য অশ্লীল বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নেয়। কয়েক বছর আগে একটি বিজ্ঞাপনে একজন হতদরিদ্র চেহারায় মানুষকে দেখান হয়েছিল, যিনি আগে 'পকেটমার' ছিলেন। বর্ত্তমানে সকলে ঐ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটির ATM Card ব্যবহার করার জন্য পকেটে টাকা রাখে না; তাই সেই মানুষটি কুলির কাজ করছেন। দরিদ্র মানুষ চিরকালই অনাদর, উপেক্ষা ও বঞ্চনা ভোগ করেছেন, কিন্তু তাঁদের নিয়ে যে উপহাস করা যায়, পণ্যভোগবাদী চিন্তাধারায় সেরকম বার্তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিষয়টা এতটাই অমানবিক হয়েছিল যে The Statesman এর মত ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় একটি শক্তিশালী মুখপাত্র তার নিন্দা করেছিল।

পণ্যভোগবাদের কুফলের পাল্লাটা হয়তো কিছুটা ভারী, কিন্তু তার সুফলও কম কিছু নয়। ভোগ করা মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি - তার চেতনার বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ভোগ করার প্রয়োজন এবং ইচ্ছা ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। আবার, ক্রমশঃ জটিল হতে থাকা এই সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষের চেতনার ক্রমবিকাশ ঘটে। ভোগ করার প্রধানতম মাধ্যম। এই কারণেই পণ্যভোগবাদ অপরিহার্য : কেউ যদি চিন্তা করেন যে তিনি কোনও পণ্য ভোগ করেন না, তাহলে তিনি ভাবের ঘরে চুরি করছেন। ভোগ করার মাত্রায় তারতম্য ঘটে : কেউ কম করেন, কেউ বেশি করেন। কেউ প্রয়োজনে করেন, কেউ প্রয়োজন তেমন না থাকলেও করেন। এখন আমরা পণ্যভোগবাদের সুফলগুলি আলোচনা করব।

পণ্যভোগবাদের সবচেয়ে প্রথম সুফল হোল যে মানুষের জীবনের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে এবং জীবন যাপনের মান বহুগুণে উৎকৃষ্ট হয়েছে। আমরা আমাদের বিদ্যালয় জীবনে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সম্পর্কিত রচনাগুলি পড়েছি। সেই 'আশীর্বাদগুলি বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক পণ্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে হাজির হয়। এর ফলে জীবন যে অনেক আরামপ্রদ হয় তাই নয়, বহু অনিশ্চয়তা আমাদের জীবন থেকে দূর হয়ে গেছে। প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আমাদের দুই-তিন সপ্তাহ পত্রালাপের উপর আর নির্ভর করতে হয় না, ইচ্ছামাত্র উপায় হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার, মানুষের জীবনকে আরামপ্রদ করে পণ্যভোগবাদ অনেক সময়ই মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করেছে। সত্তরের দশকের শেষে ভারতীয় সমাজে বর্তমান পণ্যভোগবাদের ধারাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকারান্তরে তার ফলে নারীস্বাধীনতা অনেকটা এগিয়ে যায়। এর আগে বেশিরভাগ ভারতীয় পরিবারে কয়লার উনুন ব্যবহার করা হোত এবং দুই বেলা রান্না করতে হোত। ভারতীয় নারীদের সেজন্য দিনের বেশিরভাগ সময় রান্নাঘরে কাটাতে হোত, এবং কয়লার ধোঁয়ায় অনেকেই তীব্র ঘরোয়া দূষণের শিকার হতেন। যখন সত্তর দশকের শেষের দিকে বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারে রান্নার গ্যাস উপস্থিত হোল, তখন দেখা গেল যে খরচ এমন কিছু বাড়ছে না, কিন্তু কাজ করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। সেই সময় গ্যাসের বাজার কঠোরভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল, ফলে হিসাব করে গ্যাস খরচ করতে হোত, কারণ কখনও কখনও পরবর্তী cylinder এর জন্য এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হোত। এর ফলে, বাড়ীর মেয়েদের রান্নাঘরে কাটানোর সময় অনেক কমে গেল। একই সঙ্গে ঘরে ঘরে রেফ্রিজারেটর চলে আসার ফলে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হোল এবং দূরদর্শনের আগমনের সাথে সাথেই বহু মধ্যবিত্ত, কার্যত গৃহের পরিধিতে আবদ্ধ নারীর সামনে বাইরের জগতের বিপুল সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে গেল। আশির দশকের শেষের দিক থেকে আমরা যে বিভিন্ন রকম পেশায় অধিকতর সংখ্যায় নারীদের দেখতে পাই, সেখানে পণ্যভোগবাদের পরোক্ষ অবদান থাকলেও

থাকতে পারে।

আবার, পণ্যভোগবাদ সার্বিকভাবে জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। আমরা অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছি যে বর্ত্তমান প্রজন্মের কিশোর এবং যুবকেরা পাড়ার দৈনন্দিন খেলাধূলাতেও যথেষ্ট নৈপুন্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে এই জিনিষটা বেশি করে দেখা যায়, যেখানে অনেকে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ভাল করে রপ্ত করেছে। এর কারণ দুরদর্শনে প্রতিনিয়ত সচিত্র বিশ্লেষণ হচ্ছে যে কিভাবে ব্যাটটা ধরা হয়েছে, কিভাবে সেটা ঘোরান হয়েছে, বলটাকে মাঠের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো, এবং বল করার সময় সেটি সঠিক জায়গায় এবং সঠিক গতিতে ফেলা ইত্যাদি। এছাড়া যখন আমরা National Geographic জাতীয় চ্যানেলে সমুদ্রের অনেক নীচে চলমান জীবনকে দেখতে পাই, অথবা গাছের কোটরে সাপের পাখির ডিম খাওয়া খুব স্পষ্টভাবে দেখি, তখন আমরা একটা অজানা জগৎকে যে শুধু প্রত্যক্ষ করি তাই নয়, মানুষের বুদ্ধি, ইচ্ছা, ক্ষমতা এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করার নিরন্তর প্রয়াস দেখতে পাই। অন্যদিকে, এই বিপুল পরিমাণ কর্মকান্ডকে বজায় রাখার জন্য বহুসংখ্যক মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ — উভয় প্রকারে অবদানের প্রয়োজন হয়। এর দ্বারা তাঁদের যে শুধুমাত্র জীবিকার ব্যবস্থা হয় তাই নয়, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতায় পরিচয় দিতে পারেন এবং তাঁদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য, সন্তোষ এবং সম্মান তাঁদের পারিপার্শ্বিক সমাজের চোখে স্বপ্ন এবং উচ্চাকাঙ্খার বীজ বুনে দেয়। এই রসদের উপর ভিত্তি করেই মানবসভ্যতা এগিয়ে চলে।

তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় বিপুল পরিমান পণ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে চায়। আজকে যিনি অল্পমূল্যের কোনও একটি বিশেষ পণ্যের স্বাদ পাচ্ছেন, আগামী দিনে আরও সুফলের আশায় হয়তো সেই পণ্যের জন্য আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করবেন। যেমন ছাত্রজীবনে অনেকে হয়তো অল্পমূল্যের ক্যামেরা অথবা টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করেন, চাকরি পাওয়ার পর বা স্বনির্ভর হওয়ার পর অধিকতর মূল্যবান ক্যামেরা বা সঙ্গীতশ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করেন। এইভাবে মানুষের শখ-এর সৃষ্টি ও তৃপ্তি হয়। অন্যভাবে, পণ্যভোক্তার কাছে এই পণ্যগুলি তাঁর সম্পত্তি হয়ে যায়। মানুষের সম্পত্তি তার পরিচয় নির্মাণে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকেই চান তাঁর সুন্দর জামাকাপড়, ব্যাগ, ঘড়ি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অথবা গাড়ী তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীরা দেখে তারিফ করুন। যখন আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া কেউ সুন্দর পণ্য ব্যবহার করেন, সেটি তাঁর মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার ব্যাপারে অক্সিজেনের কাজ করে। আজকাল মহানগরগুলিতে প্রায়ই একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বহু মানুষ, যাঁরা বিভিন্ন ধরনের কায়িক পরিশ্রমে যুক্ত

থাকেন, যথা গাড়ী চালানো, সাফাই, তরিতরকারী বিক্রয় করা, তাঁরা অনেকসময়ই সুন্দরভাবে পোষাক পরেন, মোবাইলে কথা বলেন বা Walkman-এ গান শোনেন। অনেকসময়ই হয়তো তাঁরা পেশার কারণে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবেই সমাজের কাছ থেকে তাচ্ছিল্য পান, কিন্তু এই সব পণ্য ভোগ করার ফলে নিজেদের একটা পরিসর তৈরী করে নিতে পারেন এবং সেই সামাজিক পরিসরে তাঁদের পরিচয় নির্মিত হয়। পণ্য ভোগবাদ এক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল কাজ করে ঃ বাজারের চোখে, অভিজাত — অভাজন নির্বিশেষে সকলেই 'সমান' সকলেই একই জমির উপর দাঁড়িয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা অর্থ ব্যয় করছেন। এটা হয়তো ঠিক যে এইসব পেশার মানুষেরা অন্যান্য ক্ষেত্রে — বিশেষতঃ আবাসন এবং আহার্যের, ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃচ্ছসাধন করেন, কিন্তু সেটা তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সচ্ছল সমাজের কেউ কেউ হয়তো এই মানুষদের সম্পর্কে নানান অসম্মানজনক মন্তব্য যথা 'neo-rich' (উঠতি বড়লোক) বা 'এত কায়দা, বাড়ীতে দেখুন হাঁড়ি চড়ে না' ইত্যাদি করে থাকেন, কিন্তু পণ্য ভোগবাদের ফলে এইসব ক্ষুদ্র ভোক্তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে যথেষ্ট শক্তি লাভ করে থাকেন। তাছাড়া কেউ যদি মনে করেন যে তিনি বাইরের সমাজের কাছে নিজের অসুবিধার কথা জানাবেন না, তাহলে তাঁর সেই অধিকার সম্পূর্ণরূপে রয়েছে। আবার কেউ যদি অপর কারো কোনও রকম ক্ষতি না করে বা কাউকে বঞ্চিত না করে নিজের উপার্জিত অর্থ নিজের মনোমত খাতে ব্যবহার করতে চান, তাঁর সেই অধিকার সম্পূর্ণরূপে আছে। পণ্য ভোগ করার, ফলে যদি কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা তাঁদের অসহনীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কথা ভুলে থাকতে পারেন, কিছুক্ষণের জন্য মানসিক ভাবে চাঙ্গা বোধ করেন, তাহলে পণ্যভোগবাদ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করে। কারণ এইসব মানুষের সেই আত্মবিশ্বাস সাময়িক হলে তার মনস্তাত্ত্বিক মূল্য তর্কাতীত ভাবেই দীর্ঘস্থায়ী সুদূরপ্রসারী — হয়তো তাঁরা এর মধ্যে থেকেই আর্থ-সামাজিক উর্ধগতির চাবিকাঠি পেয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু, পণ্যভোগবাদের কুফলও এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেই উঠে আসে। সম্পত্তির ভিত্তিতে মানুষের পরিচয় নির্মিত হওয়া, দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি বহু পুরোন সামাজিক ব্যাধি। এর ফলে মানবিক সত্তা — যেসব কারণে মানুষের মধ্যে বন্ধন তৈরী হয়, সেগুলি গৌন হয়ে যায়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যায়। মানুষ কতটা অর্থ উপার্জন করছে, কি কি পণ্য ভোগ করছে সেগুলি মুখ্য হয়ে যায় — কিভাবে সেই অর্থ উপার্জিত হচ্ছে , তার জন্য কেউ অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে কিনা, সমাজ, ন্যায়নীতি এবং আইনের চোখে সেই উপায়গুলি বৈধ কিনা সেসব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়। ফলতঃ যাঁদের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা আছে তাঁরা লাভবান হন, কারণ তাঁদের কাম, ক্রোধ, লোভ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ইত্যাদির প্রকাশের চূড়ান্ত ছাড়পত্র তাঁরা পেয়ে যান। সমাজের

মতো দুর্নীতি ও অপরাধ বাড়তে থাকে, এবং জনসাধারণের অতিবৃহৎ একটি অংশ তার কুফল ভোগ করে।

একই সঙ্গে দরিদ্র মানুষও এই ফাঁদে পা দেন। সংসারের সামান্য বিত্ত ভবিষ্যতে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য বিচক্ষণ উপায়ে ব্যয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং তাৎক্ষণিক সুখে গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে, যেসব দরিদ্র পরিবারে বিলাস দ্রব্য ভোগ করার উপায় থাকে না, সমাজ জীবন থেকে কার্যত তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরিবারের ভিতরে ভয়ঙ্কর অশান্তি দেখা যায়। বিশেষভাবে, পরিবারের অল্পবয়স্ক সদস্যরা যারা সুখী, নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ, মনের মত জীবনসঙ্গী ইত্যাদির স্বপ্ন দেখে, তারা অনেক সময়ই ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সংযম ইত্যাদি হারিয়ে ফেলে এবং দৈনন্দিন জীবনের চাপ ও নিষ্পেষণের মুহূর্তে হিংস্রতা ও অপরাধ প্রবনতার দিকে এগিয়ে যায়। অনেকে আবার এই কঠিন বাস্তবকে ভুলে যেতে মাদকাসক্তির পথে পা বাড়ায়। এইভাবে দেশের যুবশক্তির বিপুল অপচয় ঘটে — সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত অংশটি যখন আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হয় না, তখন সমাজের মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে যায়। আবার, অনেক সময় দেখা যায় যে কোনও দরিদ্র ব্যক্তি সততা, উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে দারিদ্র্যকে পরাজিত করেছেন , কিন্তু সেই গুণগুলি তাঁর পরবর্ত্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি। তার কারণ, পরবর্ত্তী প্রজন্ম আরাম উপভোগ করেছেন, সুখ, নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি পেয়েছেন, কিন্তু অভাব দেখেন নি, সংগ্রাম দেখেন নি।

বস্তুত পণ্যভোগবাদের যুগে মানুষ জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই অনেক জিনিষ পেয়ে যাচ্ছে এবং অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছে। এরফলে, বহুকাল ধরে চলে আসা সনাতনী, কিন্তু যথেষ্ট মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা তারা আত্মস্থ করতে পারছে না। যেমন, আমরা যা কিছু আকাঙ্খা করি তা আমাদের ধৈর্য্য সহকারে শ্রমের দ্বারা উপার্জন করতে হবে, আমরা যা চাইব তাই আমরা পাব না অথবা কারো চোখের জলের মূল্যে, অর্থাৎ কাউকে বঞ্চিত করে কিছু নেওয়া উচিত নয়। এর ফলে বহু মানুষ ধৈর্য্য হারা ও স্বার্থপর হয়ে পড়ছে এবং একধরনের চোরা হিংস্রতা তৈরী হচ্ছে। খুব সহজেই খেলার মাঠের বচসা — যেগুলির ভিত্তিতে মানুষের চেতনা পরিণতি লাভ করে, বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়, সেসব রক্তারক্তি খুনোখুনির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আবার, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে বা কখনও কখনও বাবা-মায়ের বকুনির ফলে অনেক কিশোর কিশোরী আত্মহত্যা করছে।

একই সঙ্গে, পণ্যভোগবাদ বর্ত্তমান তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশকে অলস অসামাজিক করে ফেলছে। বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অনেকে খেলাধূলা না করার দু'খানা কারন দেখান ঃ সময়ের অভাব ও খেলার মাঠের অভাব। এদের অনেকে বাড়ীতে বসে টেলিভিসন দেখেন অথবা electronic games খেলেন। কিন্তু এছাড়াও দেখা যাবে

যে বিকাল বেলা খেলার মাঠে অনেক তরুণ খেলাধূলায় অংশগ্রহণ না করে গ্যালারিতে বসে আড্ডা মারেন, ধূমপান করেন ও মোবাইলে ছবি দেখেন। অনেকে বলেন যে খেলতে গেলে নাকি ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। কিন্তু খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করার ব্যাপক সামাজিক শিক্ষা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন ঃ খেলাধূলা মানুষকে দায়িত্ব নিতে এবং সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখায়, এবং মানুষের শারীরিক ও মানসিক সচলতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু পণ্যভোগবাদের অলস বিনোদনে নিমজ্জিত হয়ে অনেকে এই দিকটা উপেক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে যাঁরা সে সময় আড্ডা দিচ্ছেন তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে কাজেও সফল হন না ঃ আড্ডা দিতে গেলে, অর্থাৎ কোনও বিষয়ে কথা বলতে হলে সে বিষয়টা গভীরভাবে জানা প্রয়োজন, অর্থাৎ চর্চা, অধ্যয়ন ও মনন প্রয়োজন — একটি অলস মন যা করতে অপারগ হয়।

পণ্যভোগবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রয়োজন, শখ ও অর্থহীন বিলাসিতার মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যিনি সারাদিন নানান জায়গায় ছোটাছুটি করেন, যদি একটি মোটর সাইকেল ক্রয় করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর প্রয়োজন মেটাচ্ছেন — কারণ বাহনটি তাঁর ব্যবসায় উন্নতি করার জন্য দরকার হবে। আবার, কোনও দুঃস্থ ছাত্র যিনি পড়াশুনা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক, যদি বৃত্তির পয়সায় তাঁর ভবিষ্যতের উপযোগী কোনও বস্তু, যেমন বই না কিনে মোবইল ফোন কেনেন, তখন সেটি অর্থহীন বিলাসিতার পর্যায়ে চলে যায়। আবার মানুষের মত বাঁচতে গেলে কিছু শখ সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন, না হলে মানুষ যন্ত্রবৎ হয়ে পড়বে। মানুষের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নিরিখে কিছু বিলাসিতার সন্তুষ্টি প্রয়োজন, এগুলিকে শখ বলা যেতে পারে।

পণ্যভোগবাদ ও মানবসত্তা

পণ্যভোগবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে বহু কুফল থাকা সত্ত্বেও তার অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। মানুষের প্রয়োজনের অনুকূলে পণ্যভোগবাদকে কাজে লাগানর জন্য আমাদের প্রয়োজন সেসব উপায়ের খোঁজ করা, যার দ্বারা আমরা পণ্যভোগবাদের কুফলকে অতিক্রম করতে পারি।

বহু যুগ ধরে বিভিন্ন সমাজদর্শন মানুষের ভোগপ্রবনতার কুফল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে। এর মধ্যে প্রধান দু'টি চিন্তাধারা হোল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বামপন্থী সমাজচেতনা। আমরা খুব সংক্ষেপে সেগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই জগৎকে সামগ্রিকভাবে এক মায়ার বন্ধন হিসাবে দেখা হয় ঃ মানুষ যত ঈশ্বরের নিকটে যাবে তত সে সুখ দুঃখের চক্র থেকে নিষ্কৃতি পাবে। এই ধারণা অনুসারে, সত্যের সমান তপস্যা নেই এবং জগৎ সংসারের তাৎক্ষণিক

সুখ আমাদের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হোল পরার্থে এবং ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হওয়া, ভোগ বিলাস, ইন্দ্রিয়সুখে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয়। এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন ওঠে যে যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না অথবা জগৎ সংসারকে অলীক বলে মনে করেন না, তাঁরা কিভাবে পণ্যভোগবাদের কুফল থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন এবং সুফলকে কাজে লাগাবেন? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই।

অপর দৃষ্টিভঙ্গী হোল বামপন্থী সমাজচেতনা, যা মনে করে যে পণ্যভোগবাদ বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণমূলক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় এবং দীর্ঘায়িত করার একটি অত্যন্ত সফল প্রয়াস। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষের ব্যক্তিসত্তা গৌণ হয়ে পড়েছিল। ধনতন্ত্রের সূচনাপর্বে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে — তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সুখ, আনন্দ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেজন্য ধনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের ফলে ধনতন্ত্র আর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সহজাত মিত্র মনে করছে না — সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গেছে। বরং ধনতন্ত্র এখন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সন্দেহ ও ভয়ের চোখে দেখতে শুরু করছে। এহেন পরিস্থিতিতে পণ্যভোগবাদ ধনতন্ত্রের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মানুষের স্বাধীনতার দাবীকে বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যথেষ্ট সফলতার সঙ্গেই একজন ক্রেতার ভোগ করার স্বাধীনতা হিসাবে তুলে ধরছে। অর্থাৎ, ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতার বদলে পণ্যভোগ করার মাধ্যমে তার সামাজিক পরিচয় এবং অস্তিত্ব নির্মাণ করা হয়। ফলতঃ সমাজের সচ্ছল অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজেদের সুখ ও আরামকে সুনিশ্চিত করায় মন দিচ্ছেন। আবার যাঁরা এই বৃত্তের বাইরে, অর্থাৎ যাঁরা সচ্ছল উপভোক্তা নন, যাঁরা ইচ্ছা মত পণ্যভোগ করতে পারেন না, প্রচলিত ব্যবস্থায় অপূর্ণতা মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় নেই, কারণ সেই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। যদি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল ভালভাবে কাজ না করে সামনে দু'খানা পথ খোলা থাকে ঃ পয়সা খরচ করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা ক্রয় করা, অথবা বিনামূল্যে যা পাওয়া যাচ্ছে সেটাকেই মেনে নেওয়া।

The paradox of politics in the consumer era is that those who can make an impact on political decisions have little stimulus to do so, while those who depend on political decisions most have no resources to influence them (Bauman, 1997 : 55-84).

অর্থাৎ পণ্যভোগবাদী সমাজে যাঁরা সত্যিই রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারেন, সেই স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের সে বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই অপরদিকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের কোনও উপায় নেই। এভাবেই পণ্যভোগবাদ মানুষকে ক্রমশ

সমাজবিমুখ করে তুলছে।

আধ্যাত্মিক ও বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী — উভয়েই ধনতান্ত্রিক সমাজের 'eat, drink and be merry' অর্থাৎ 'খাও, পিও, জিও' সংস্কৃতির বিরোধী। কিন্তু তাঁরা সুস্পষ্ট কোনও সমাধান সূত্র দিতে পারে নি। তাঁরা মানুষের চেতনার জাগরণের মধ্যে সমাধানের খোঁজ করেছেন। তবুও কিছু সমস্যা থেকে যায়। ব্যবহারিক জীবনে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকদের একটা বড় অংশই প্রমাণ করেছেন যে পণ্য ভোগ করার ব্যাপারে তাঁরা অন্য কারো চেয়ে কম যান না। বরং এটা দেখা গেছে যে উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু মুখ্য প্রবক্তা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা পণ্য ভোগ করেন — কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাত্রাটি রূপোলি পর্দার নায়কদের সমতুল্য। আরও ন্যক্কারজনক ব্যাপার হোল যে সেই পণ্যগুলি তাঁরা সামাজিকভাবে স্বীকৃত উপায়ে — অর্থাৎ নিজেদের শ্রমের অর্থে উপার্জন করেন না; যাঁরা তাঁদের বিশ্বাস করেন তাঁদের দানে ভোগ করেন। ফলতঃ, ভন্ডামির মত একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যধি প্রশ্রয় পায়, যা সমাজের বহু প্রগতিশীল ও কল্যাণকর চিন্তাধারা ও প্রয়াসকে ভিতর থেকে কলুষিত করে। আবার, উভয় দৃষ্টিভঙ্গীতেই একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী আছেন যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের জীবন দর্শনকে প্রয়োগ করতে চান। কিন্তু জগৎসংসারকে সবসময় নিজেদের আদর্শের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করার ফলে তাঁদের পছন্দ — অপছন্দ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ঘৃণা অতিমাত্রায় প্রবল থাকে। সেকারণে তাঁরা সম্মান পেলেও কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং নিজেদের আদর্শের বিচ্যুতি বা অসম্ভবতা চিন্তা করে হতাশায় ভোগেন।

তবুও, পণ্যভোগবাদকে মানবসমাজের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু পদক্ষেপের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। সেগুলি সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হবেই একথা বলা যাচ্ছে না, তবে এই সমস্যার সমাধানে কিছু আলোকপাত করতে পারে। প্রথমতঃ, শিশুকাল থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কে এমনভাবে সাজাতে হবে যার ফলে মানুষ চিন্তা করার উৎসাহ পাবে, এবং একই সঙ্গে নিজেকে ও প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করার সাহস পাবে। এর ফলে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার বিকাশ ঘটবে, যা পণ্য ভোগ করার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে। বুদ্ধি ও চেতনার প্রয়োগ একবার শুরু হলে সেটি নেশার মত হয়ে যায় — তাকে ছাড়া যায় না। তখন পণ্য ভোগ করার সময়ও মানুষ চিন্তা করবে সেটি তার প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে কতটা আছে, কোথায় রাশ টেনে ধরতে হবে ইত্যাদি। একই সঙ্গে শিশুকাল থেকেই যাতে মানুষ শ্রমের মূল্য, সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব এবং মানুষ হওয়ার কারণেই মানুষকে সম্মান জানানোর শিক্ষা পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। এর ফলে আশা করা যায় যে শুধুমাত্র ভোগ পণ্যের উপর নির্ভর করে মানুষের পরিচয় নির্মিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, এটা সবাইকে বুঝতে হবে যে মানুষের জন্য বিনোদন, বিনোদনের জন্য মানুষ নয়। বিনোদনের উদ্দেশ্য হোল আনন্দলাভ করা। সেই কারণে প্রয়োজন সেসব বিনোদনগুলি, যেগুলি বহুকাল ধরে মানুষের সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। বই পড়া হোল সেরকম একটি বিনোদন ঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি দূরদর্শন দেখলে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাব, কিন্তু বই-এর ছাপা অক্ষরগুলির ভিতরে লুকিয়ে থাকা জীবনকে ক্রমাগত উদ্ধার করতে করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব না, বরং আরও উজ্জীবিত বোধ করব। একটি সুন্দর বই পড়ে ফেলার এক অদ্ভুত স্বর্গীয় অনুভূতি আছে। একথা ঠিক যে দূরদর্শনে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান দেখেও ঠিক সেরকমই সুখকর অনুভূতি হয়, কিন্তু দূরদর্শন প্রায়শই আমাদের চিন্তা করার অবকাশটুকু দেয়না — তারা নিজেরাই সেই কাজ করে দেয়। কিন্তু বই এর ক্ষেত্রে একজনকে চিন্তা করতেই হবে। এটা ঠিক যে দূরদর্শনে অনেক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখান হয়, কিন্তু একজন সেটা নাও দেখতে পারে। দুই দশক আগে যখন আমাদের দেশে উপগ্রহ চ্যানেলের প্রবেশ ঘটে নি, তখন রবিবার বিকাল বেলা সিনেমা দেখান হত এবং সন্ধ্যা আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলত। মাঝখানে যখন খবরের বিরতি হোত তখন অনেকে তাড়াতাড়ি উঠে কিছু আবশ্যকীয় কাজ সেরে ফেলতেন। আবার, মানুষের জীবন সহজ করতে করতে পণ্যভোগবাদ মানুষকে অনেক সময়ই বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আজকাল ফোন করে অনেক সময়ই অপেক্ষা করেন না, গান বাজতে থাকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জীবনে চলার পথ সম্পূর্ণ সঙ্গীতময়। অন্যদিকে, মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ যত ঘটবে, তত সে ভোগ্যপণ্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করতে শিখবে।

একই সঙ্গে, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের পুনরুজ্জীবন বাঞ্ছনীয়। একটি পাড়ায় যত বেশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যথা থিয়েটার, নাটক, খেলাধূলা ইত্যাদির চর্চা হবে, তত সেই পাড়ায় মানুষের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে। আবার, পাড়ার মাধ্যমেই মানুষ পরিবারের গন্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন যৌথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ পাড়ার সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবে, সুখী গৃহকোণের মধ্যে নানারকম পণ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, কারণ সেইসব যান্ত্রিক আনন্দের বাইরে যৌথ সমাজজীবনের আনন্দের স্বাদ সে পেয়ে যাবে। একই সঙ্গে, তার সমাজ সচেতনতা বাড়বে। এটা ঠিকই যে পাড়ার অনুষ্ঠানের মধ্যেও এখন কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং মাঝে মাঝেই আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের আড়ালে নির্ভেজাল আনন্দ হারিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য পাড়ার মানুষেরাই ঠিক করবেন তাঁরা মূলতঃ কি চান। তাঁদের অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা, চেতনা ইত্যাদি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদি মানুষ অন্ধ পণ্যভোগবাদের কুফল সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাঁদের মানুষের মত বাঁচার সুযোগ দেবে — জীবন থেকে দূরে থাকার পরিবর্তে,

তাঁদের চেতনা ও সামাজিক বৃত্তি স্ফুরণের উপায় থাকবে। কারণ প্রত্যেকেই স্বীকৃতি চান, এবং স্বীকৃতি পাওয়ার উপায় হোল অন্যদের কিছু চাহিদা, যেগুলির সঙ্গে নিজের চাহিদার কোনও বিরোধ নেই, সেগুলির পূরণ করা। যৌথ সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেই সেগুলির পূরণ করা সম্ভব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রবন্ধটির পূর্ববর্ত্তী খসড়া ১৪ই মে ২০০৭ তারিখে উলুবেড়িয়া কলেজের পাঠচক্রে আলোচনা করা হয়েছিল। আমি সেই পাঠচক্রে উপস্থিত প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও প্রশ্নাবলী এই প্রবন্ধের পুনর্লিখনে সাহায্য করেছে। যদি কোনও ভ্রান্তি বা অপূর্ণতা থেকে যায়, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই আমার নিজস্ব।

গ্রন্থপঞ্জী

- Bauman, Zygmunt (1997) – *Freedom* (Delhi : World View)
- Marshall, T.H. (1977) – 'Citizenship and Social Class' in S.M. Lipset (ed.) – *Class, Citizenship and Social Development* (Chicago : University of Chicago Press), pp. 71-134.
- Sen Amartya (2000) – *Development as Freedom* (New Delhi : Oxford University Press).

'সেকেলে কথা'-য় সেকালে কথা ঃ প্রসঙ্গ নিস্তারিনী

ডঃ জয়শ্রী সরকার
ইতিহাস বিভাগ

"স্বামী কেমন দেখলুম না, স্বামী স্বর্গে গেলেন। এ সকল দেখে শুনে, যে মরণ-বাঁচন তৈয়ারী করেছে, তাকে গাল দিতে ইচ্ছা করত। ..... সংসার আরম্ভ না করে, মরণের দাগা পাওয়া বড় কষ্ট।" ——

উনিশ শতকে কৌলীন্য প্রথার কবলে অভিশপ্ত যার জীবন, সেই নিস্তারিনীর বিষন্ন স্মৃতিচারণায় এই হাহাকার আর অভিমান। নয়-দশ বছরে বয়সে নিস্তারিনীর বিয়ে হয়েছিল খানাকুল-কৃষ্ণনগরের এক স্বকৃত-ভঙ্গ কুলীন, পঁচিশ বছর বয়সী বহুপত্নীক ঈশ্বর চাটুয্যের সাথে। নিস্তারিনী সহজ ভঙ্গিতে বলেছেন, "তাহার কিন্তু ৩০/৪০ টি বিবাহের খবর পাওয়া গেল।" তাই কুলীন স্বামীর সাথে নিস্তারিনীর বিয়েটা ছিল নিস্তারিনীরই কথায়, "বিবাহ হল, বর চলে গেলেন, স্বপ্নের মত আমার আইবুড়ো নাম খন্ডে গেল।"

কৌলীন্য প্রথায় বহুবিবাহ নিবারণে বিদ্যাসাগর, নব্যবঙ্গগোষ্ঠী, ব্রাহ্মসমাজ, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং অনেক শিক্ষিত হিন্দু 'ভদ্রলোকদের' প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে তা একটি সুদীর্ঘ, স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে। বর্তমান প্রবন্ধ প্রধানত নিস্তারিনীর 'সেকেলে কথা' - কে কেন্দ্র করেই পরিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া এই প্রথা নারী মানসে এবং জীবনে কি প্রভাব ফেলেছিল সেগুলি জানবার তাগিদে নিস্তারিনীর প্রায় সমসাময়িক কিছু নারী রচনাও ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে নিস্তারিনীর জীবনকথা শুধু তাঁরই পরিণত বয়সের স্মৃতিভারাক্রান্ত মনের বহিঃপ্রকাশই নয়, এটা বিগত যুগের সমাজ চিত্রের একটি করুণ ছবি।

আনুমানিক ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার খন্যান গ্রামে নিস্তারিনীর জন্ম। তাঁর বাবা, হরচরণ বন্দোপাধ্যায়, ঠগী দমনকারী স্লীমান সাহেবের অন্যতম সহকারী-কর্মচারী ছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিস্তারিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন প্রখ্যাত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বিদ্যাশিক্ষা থেকে বঞ্চিতা নিস্তারিনী মুখে মুখে তাঁর জীবনকথা "সেকেলে কথা" বলে যান আর অনুলিখনের কাজ করেন ভ্রাতুষ্পুত্র মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

সতীদাহ-র মত নির্মম সামাজিক প্রথা আইনের (১৮২৯) সাহায্যে ও জনমতের প্রভাবে অনেকাংশে নিবারিত হয়েছিল। কিন্তু নারীজীবনের অভিশাপ হিসাবে তখনও এমন অনেক প্রথা প্রচলিত ছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা।

৯'টি কুললক্ষণ (আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ এবং দান) নিয়ে দ্বাদশ শতকের বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথা পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শূন্যগর্ভ এক সামাজিক মর্য্যাদা, এক ধরণের বিবাহ-ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। বল্লাল সেন-এর পুত্র লক্ষ্ণ সেন-এর সময় একটি গুরুতর পরিবর্তন হয়। প্রথম প্রথম গুণানুসারে নতুন নতুন ব্যক্তিকে কুলীনের মর্য্যাদা দেওয়া হত। তিনি কুলীনের বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক নিয়ম করলেন। এই নিয়ম কারা কতদূর অনুসরণ করছে তা বিচার করে কুলীনদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করলেন। ক্রমে কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যক্তিগত গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে পৈতৃক বংশগত মর্য্যাদায় পরিণত হয়েছিল। দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। অর্থাৎ যারা একই প্রকার দোষে দোষী, তাদের নিয়ে এক একটি ভিন্ন সম্প্রদায় হল। রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণের ছত্রিশটি মেলে বদ্ধ। গাঁঞি গোত্র মিলিয়ে এক একটি মেলের সাথে এক একটি পালটি ঘর ছিল। সেই দু'টি পালটি ঘরের পরস্পরের মধ্যেই সব সময় বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থির করা হত। তবে সবসময়ই যে পালটি ঘরে পাত্র পাওয়া যাবে এমন কোন স্থিরতা ছিল না। তাই পালটি ঘরের পুরুষের জন্য কুলীন কন্যাদের অপেক্ষা করতে হত, হয়ত কখন বা সারাজীবন। নিস্তারিনীর মানুষের প্রবর্তিত এই প্রথার বলি হয়েও, সমাজকে দায়ী করেননি — ".... সমাজকে মানছে না, একথাটা বলা তখনকার কালে বড় কঠিন ছিল। সমাজ ত একজন লোক ছিল না। সমাজের দৃষ্টি ছিল অনেক লোকের বিশুদ্ধি রাখা। সমাজের ব্যবস্থাও সবরকম লোকের উপযোগী ছিল।"

কুলীন পরিবারের কন্যা, নিস্তারিনীর কাছে কিছুই যেন অস্বাভাবিক নয়। তাঁর বলার ভঙ্গীটিও খুবই সাবলীল। তাঁর প্রপিতামহ বিয়ে করেছিলেন একশ আটটি, পিতামহ ছাপান্নটি এবং পিতা মাত্র দু'টি। পিতা হরচরণ ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। নিস্তারিনীর কথায় কোথায় যেন একটা গর্বের সুর শোনা যায় পিতার জন্য — "এরূপ ছেলে যদি আবার কুলীন হয় ও ঘরজামাই থাকিতে চায়, তবে সেকালের বাজারে পড়তে পায় না।" তাই ১২/১৩ বছর বয়সেই হরচরণ শ্যামনগরের নপাড়ার জমিদারের কন্যার পানিগ্রহণ করলেন কারণ সে যুগের ধারণায়, "বড়মানুষ শ্বশুর হলে ..... সহজেই চাকরীবাকরী হবে ..... সে চাই কি একদিন থানার দারোগা হবে।" নিস্তারিনীর কথায় "তখন যে যত বিবাহ করিতে পারিত সে তত ভাল কুলীন বলিয়া জনসমাজে বিদিত থাকিত। ..... তখনকার পুরুষেরা শত পরিবারের পিতামাতার নিকট হইতে নিজের খরচ চালাইয়া লইত।" বহু বিবাহকারী কুলীন পুরুষেরা "যেখানে যেখানে বিবাহ করিত, সেখানকার খাতা রাখিত।" নিস্তারিনী দেখেছিলেন তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এরকম একটি খাতা ছিল। সেখানে তাঁর ছাপান্নটি শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা লেখা ছিল এবং "যে একটু স্থান খাতার পার্শ্বে ফাঁক থাকিত, সে স্থলে তিনি টাকার

কথা, পুত্রাদির কথা এবং যেগুলি তাঁহার লোক-লৌকিকতা আদায়ের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহাই লিখিয়া রাখিতেন।" বিবাহই যেহেতু বেশীরভাগ কুলীন পুরুষের জীবনধারণের মাধ্যম ছিল, তাই "যেখানে পাওনা দক্ষিণা বেশী, সেখানে যাতায়াতও তত বেশী হইত।" অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই প্রথা ভয়াবহ সামাজিক আকার ধারণ করেছিল। আনুষঙ্গিক কুফলগুলিও দীর্ঘদিন অব্যাহত রয়ে গিয়েছিল।

কুলীন ব্রাহ্মণের বহু পত্নীরা তাদের পিতৃগৃহেই দিন কাটাতে বাধ্য হত; স্বামীর সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিন দেখাসাক্ষাত হত না। বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছিলেন, "স্বামী গৃহবাস, স্বামী সহবাস, স্বামীদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীন কন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।" সেই একই বেদনার সুর বাজছে 'সেকেলে কথা'-য় "পত্নীর ভরণপোষণ একটা কর্তব্যের মধ্যে, তাহা তখনকার বিবাহিতদের কল্পনাও আসিত না"। বরং এক চিত্র লক্ষ্য করা যায়। পিতামহ যখন নিস্তারিনীর পিতামহী জগদম্বার বাপের বাড়ীতে আসতেন, তখন তাঁর 'পা-ধোয়ানি, নমস্কারি, ভোজন-দক্ষিনা, এ সকল না দিলে, সে এরূপ শ্বশুরগৃহে পা ধুইবে না, নমস্কারি কাপড় না হইলে একরাত্রও বাস করিবে না, ভোজন-দক্ষিণা না পাইলে সে বাটিতে আর আহার করিবে না।"

নিস্তারিনীর শ্বশুরকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা দেওয়ার পাকা বন্দোবস্ত করে, পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে নিস্তারিনীর দাদা দেবীচরণ জামাইকে অর্থাৎ নিস্তারিনীর স্বামীকে শ্বশুরবাড়ী আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু জামাই যখন জানতে পারলেন যে এটা একটা বড় ফাঁকি কারণ সে টাকাটা কথামত নিস্তারিনীর শ্বশুরকে পাঠানো হয় নি, তখন তিনি বিদায় নিলেন। মৃত্যুর আগে অসুস্থ জামাইকে নিস্তারিনীর মা নিয়ে এসেছিলেন। স্বামীর ভালোবাসায় বঞ্চিত নিস্তারিনীর সুরে ফুটে উঠেছে বহুপত্নীক স্বামীর জন্য বেদনা, "মার ইচ্ছা, তাঁকে যত্ন করে খাওয়ান। বাড়ির লোকেরা তাঁর জন্য খরচ করতে বিরক্ত। .... অন্য সকলে তাঁকে তাচ্ছিল্য করত। তাঁর কষ্টের আর সীমা ছিল না।"

চৌদ্দ বছর বয়সে নিস্তারিনীর জীবনে নেমে এল অকাল বৈধব্য — "আমার স্বামীভোগ মোটেই কপালে লেখা ছিল না।" কিন্তু তিনি যে যথাসময়ে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বৈধব্যের নিয়মগুলি পালন করতে পেরেছিলেন, তার জন্য নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করতেন কারণ "আমার সতীনেরা অনেকেই এখবর হইতে বঞ্চিত থাকিয়া, মাছ ভাত খাইয়া, অনেকদিন পর্য্যন্ত মহাপাতক করিয়াছিলেন।" তাঁরই রচনায় রয়েছে বহু টুকরো ঘটনা। অনেকদিন পরে কালীঘাটে তাঁরই মত এক বয়স্থা মহিলার সাথে পরিচয়ের পর নিস্তারিনী জেনেছিলেন যে ঐ মহিলা তাঁরই এক সতীন অর্থাৎ ঈশ্বর চাটুয্যের বহুপত্নীদের মধ্যে অন্যতম। নিস্তারিনী অক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, "সে এখনও জানে না, তার স্বামী মরেছেন, কি বেঁচে আছেন।" নিস্তারিনীর কাছে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হয়ে

সতীনের "কান্নাটা তার ভিতর থেকে বেরুচ্ছে বলেই মনে হল। বিয়ের পর কিন্তু সে স্বামী কেমন — তা একদিনও দেখে নাই।" স্বামীর কর্তব্য পালন না করলেও তার অস্তিত্বই, হলই বা পরোক্ষ্য, তাই হয়তো সেই মহিলার কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। তিনিও হয়তো নিস্তারিনীর মত স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভেবেছিলেন "আমার সব ফুরিয়ে গেল।"

নিস্তারিনীর জীবন কেটেছিল বাপের বাড়ীতে, সহ্য করতে হয়েছিল অশেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবহেলা। "চাকরবাকর পর্য্যন্ত বউয়ের (জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী) দেখাদেখি আমাকে তাচ্ছিল্য করত। আমার রাত্রে কোন খাবার বরাদ্দ ছিল না।" সবার মন রেখে চলা নিস্তারিনীর অসুস্থ অবস্থাতেও অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিন কাটত "বিধবার আবার ব্যারাম কি? ... মরে মরে রাঁধি আর কাঁদি।" স্বজন হারানোর ব্যাথা সহ্য করে, নিঃসঙ্গ , নিঃসন্তান অবস্থায় কাশীতে তাঁর জীবনাবসান। তাঁর রূপের খ্যাতি ছিল। অকাল বৈধব্য নেমে এলেও প্রলোভনের হাতছানিতে সাড়া দেননি। আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রীর মত বলেছেন — "আমাদের স্বামী ভগবান, সর্ব্বস্ব।" সংবাদ কৌমুদীর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে একজন নাম না জানা কুলীন কন্যা "অমুকী"-র কথা। সে জন্মের পর তার চল্লিশবার বিবাহিত কুলীন বাবাকে দেখেনি। দশ বছর বয়সে অমুকী আর তার দুই মাসতুতো বোনের সাথে বৃদ্ধ এক কুলীন ব্রাহ্মণের বিয়ে হয়েছিল। অমুকী তার মামার বাড়ীতে কখনও দাসী কখনও পাচিকার কাজ করেই জীবন কাটিয়ে দিল। সে জানাচ্ছে যে বিয়ের পর প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেছে কিন্তু "পতির সহিতদর্শন নাই। বর্তমান আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি।"

কিন্তু উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে এটাই পরিচিত চিত্র নয়। বিদ্যাসাগরের ভগ্ন কুলীন গুরুমশায় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রী ও কুলীন পরিবারে বিবাহিতা কন্যার শেষ অবধি আশ্রয় হয়েছিল পতিতালয়ে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এই দুই অসহায়ার ভরণাপোষণে কেউই রাজী ছিল না। বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। বইটির নাম "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।" সেখানে তিনি তুলে ধরেছেন একটি অতি বাস্তব সত্য "বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষপ্রকারে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। ..... ব্যাভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে।" একই শিরোনামে তাঁর দ্বিতীয় বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেব, ১লা এপ্রিল। বাদ প্রতিবাদের বিরাম ছিল না। কিন্তু কুলীন কন্যাদের অবস্থায় পরিবর্তন হয়নি। বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত কোলকাতার এক পতিতার চিঠি প্রকাশ করে কুলীন কন্যাদের শোচনীয় অবস্থা দেখাবার চেষ্টা করছেন। সেই পতিতা এককালে ছিল একজন কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী। কিন্তু প্রলোভনের হাতছানি অস্বীকার করার ক্ষমতা তার ছিল না

এবং শেষ আশ্রয় পেয়েছিল পতিতালয়ে। আসলে এই চিঠির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ পতিদের সতর্ক করা যে এই প্রথার কলে সমাজশরীরে কতটা ক্ষয় হচ্ছে। স্বামী উপেক্ষিতা এবং ভরণ পোষণের স্বজন অস্বীকৃতা এমন বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহিতাদের শেষ ঠিকানা ছিল পতিতালয়ে তা সরকারী নথির থেকেও জানা যায়। বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে জানা যায় যে কুলীন পরিবারগুলিতে এই প্রথার কুফলগুলি ঢাকা দেওয়ার কত রকমের উপায় উদ্ভাবন করা হত। এই জায়গায় নিস্তারিনীর কিছু কথা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় — "তখন সমাজের ভিতর থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে সবরকম স্লেচ্ছাচার চলত, ... তুমি লুকিয়ে উচ্ছন্নে যাও, তাতে সমাজ কিছু বলবে না।"

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মহিলাদের রচনায় প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গমহিলা রচিত সর্বপ্রথম কাব্যপুস্তক কৃষ্ণকামিনী দাসীর (মিত্র মুস্তৌফী) 'চিত্তবিলাসিনী"। পুরুষ-শাসিত সমাজে অন্তঃপুরবাসিনী একজন গৃহবধূ হয়েও তিনি বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতির ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। এই কাব্যে দু'টি কাল্পনিক নারী চরিত্র নবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে দিয়ে কৌলীন্যপ্রথার কুফল হিসাবে চারিত্রিক শিথীলতা, ভ্রূণহত্যা, পতিতাবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি একটি আশাও করেছেন,

"কুলীন কুমারীগণে করিতে উদ্ধার।
কি জানি ভারতে কেবা হবে অবতার।।"

কয়েক বছর পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল পাবনা জেলার গৃহবধূ বামাসুন্দরী দেবীর প্রবন্ধ-পুস্তিকা "কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?" সেখানে তিনি বলছেন, "কৌলীন্য প্রথা এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলে এদেশের অশেষ মঙ্গলসাধন হইতে পারে।.... এই বিবাহই সকল অনিষ্ট এবং সকল প্রকার অধর্ম্মের প্রধান ভাণ্ডার হইয়াছে। ইহাকেই ভ্রূণহত্যা এবং ব্যভিচার দোষের আকর বলিয়া সহজেই স্বীকার করিতে হইবেক।" তাই তিনি দেশীয় সমাজপতিদের কাছে মিনতি করছেন "হে দেশীয় মহোদয়গণ! ভ্রমরূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া একবার জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন করিয়া দেখ যে এই কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকাতে কত অনিষ্ট হইতেছে।" তবে তাঁর প্রবন্ধের সূচনাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মদেব উপর অশেষ আস্থা ও বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায় "এই ক্ষণে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর আমাদের সকল আশা, সকল ভরসা ..... কুসংস্কার অবিশ্বাস লোকভয় স্বেচ্ছাচার এই সকলের মূল কিসে শুষ্ক হয়? ব্রাহ্মধর্ম্মে।" ব্রাহ্মসমাজের উপর অশেষ আস্থা রেখেই বিক্রমপুর সোহাগদলের সুদক্ষিণা সেন-এর বিধবা মা কৌলীন্যপ্রথার গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে তিনটি নাবালক পুত্রকন্যাদের নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে এসেছিলেন। সমাজকে অগ্রাহ্য করার

দুঃসাহস (সেকালের প্রেক্ষিতে) নিস্তারিনীর না হলেও, সুদক্ষিণার (জন্ম ১৮৫৯) মাতের হয়েছিল কারণ মৃত স্বামী তাঁর মনোভূমি নির্মাণে সহায়ক হয়েছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণ হলেও, স্বামী জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় "বহুবিবাহ পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন।" আমৃত্যু নারীশিক্ষায় বিশ্বাসী ও বাল্যবিবাহ-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন সুদক্ষিণার বাবা। তাই সুদক্ষিণার 'জীবনস্মৃতি' তে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ — "আমার স্বর্গস্থিত পিতৃদেবের আশীর্বাদেই মাতৃদেবী ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক অসীম সাহসে — হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের জাল ভেদ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ - তরণীতে তিনটি অপোগণ্ড শিশু লইয়া ভাসিতে পারিয়াছিলেন।"

'সেকেলে কথা'-য় নিস্তারিনী একটি বিরল, অত্যাশ্চর্য চিত্র এঁকেছেন। অনিষ্টকারী সামাজিক প্রথা যে পরিবারে আঁকড়ে ধরার তীব্র প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এবং সমাজকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি যেখানে নেই, সেখান নিস্তারিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরেও, পরিবার তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিল। নিস্তারিনী ও তাঁর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন এবং সেই সাহায্য গ্রহণ করতে কেউই দ্বিধা বোধ করেনি। কালীচরণের বড় মেয়ের বিবাহ, নিস্তারিনীর স্মৃতি চারণ করছেন যে, বাড়ীতে হয়েছিল যাতে নিস্তারিনীর মা সেই বিবাহ দেখে যেতে পারেন। এই দিক থেকে আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত ছিল তাঁর মন। তিনি বলছেন, "খৃষ্টান বলে পরিবারের কেহই তাকে অমান্য করে নাই; বরং প্রণাম করবার সময় সে কথা ভুলেই যেতো। খৃষ্টান হলে সে হিন্দু ভাইয়ের সঙ্গে তফাৎ হয়ে যায়, এ ভাবটী কালীচরণ এমন মেরে দিয়েছিলো যে ..... সে ভাইফোঁটা নিতো, জামাইষষ্ঠী কত্তো"।

কুলীন বহুবিবাহ প্রথা সমাজ দেহে কতটা গভীরভাবে শিকড় গেঁড়ে বসে রয়েছে এবং তার প্রাদুর্ভাব কমে যায়নি হয়তো সেই প্রমাণের মানসে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কয়েকটা বছর প্রায়ই বিদ্যাসাগর হুগলির বহু গ্রামে ঘুরে অমানুষিক পরিশ্রমের সাহায্যে বহুবিবাহকারী কুলীনদের সন্ধান করে একটি তালিকা তৈরী করেন। মোট ছিয়াশিটি গ্রামের একশ সাতানব্বই জন কুলীন সন্তান সে সময় বহুবিবাহ করেছিলেন। এঁরা সর্বসমেত এক হাজার বারোশ অষ্টাশি জন বঙ্গরমণীর পাণিগ্রহণ করেন।

যদিও ভারত সরকারের উৎসাহের অভাবে আইন প্রনীত হয়নি, বহুবিবাহ নিরোধক আইন রচনার জন্য তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য প্রয়াস, বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রমে, আর কেউ নেয়নি। বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে ব্যাপক প্রচলিত এই প্রথা আইনের সাহায্য ছাড়া বন্ধ করা সম্ভব নয়। সমসাময়িক বহু শিক্ষিত হিন্দুই আইন করে বহুবিবাহ রোধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে তা বন্ধ হয়ে যাবে। হিন্দু সমাজ-সংস্কারে বিদেশী ইংরেজদের সাহায্য নেওয়া উচিত নয় বরং সমাজের অভ্যন্তরীণ

শক্তির বলেই ত্রুটিগুলো দূর করা শ্রেয়।

নিস্তারিনীর পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এই কুলপ্রথা রক্ষিত হয়নি। নিস্তারিনী হয়তো কিছুটা অবাক হয়েছিলেন, "যাদের ঠাকুরদাদার ৫৬টা বিয়ে, — বুড়ো দাদার ১০৮ টা বিয়ে — তারা বিয়েকে ভয় পায় কেন বলা যায় না। বড় ভাইয়ের ছোট ছেলে ভবানী (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) তো মোটে বিয়ে করে না। ছোট ভাইয়ের মেজ ছেলে বিয়ের নাম শুনে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়। সে বিয়ে করেনি।" জীবনের সায়ংকালে এসে নিস্তারিনীর কথায় ধরা দিয়েছে সমাজকে অগ্রাহ্য করার এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মনোভাব — "এসব ভেবে মনে হয়, যেটা ভালো, যেটা সভ্য, সেইটাই টিকে যায় যেটা খারাপ, যেটা মিথ্যা, সেটা যে সমাজের মধ্যেই থাক্, কখনও টেকে থাকবে না।"

সমাজের কুপ্রথায় নির্যাতিত হয়েও, এইসব অবলা নারীরা সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য তাঁদের অদৃষ্টকেই দায়ী করেছিলেন। তাঁরা যে সমাজের ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার, তা উপলব্ধি করার মতো পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি সবার ছিল না, আর যাঁদের ছিল, তাঁদের আর্তি, কতিপয় কিছু নারী হিতৈষী বাদ দিয়ে, শুনবার মতো কেউ ছিল না। আসলে নিস্তারিনীর মতো মহিলারা দাঁড়িয়ে ছিলেন সভ্যতার সেই যুগসন্ধিক্ষণে যেখানে তাঁরা মুখ ফুটে তাঁদের বেদনার কথা জানিয়েছেন কিন্তু বেদনার প্রকৃত কারণটিকে চিহ্নিত করতে পারেন নি।

—:—

সহায়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ

১। নিস্তারিনী দেবী, 'সেকেলে কথা, নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমলকুমার সান্যাল (সম্পাদক), আত্মকথা, খণ্ড ২, কোলকাতা ১৯৮২।

২। কৃষ্ণকামিনী দাসী, চিত্তবিলাসিনী, কোলকাতা ১৮৫৬।

৩। বামাসুন্দরী দেবী, "কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?", কোলকাতা ১৮৬১।

৪। সুদক্ষিণা সেন, জীবনস্মৃতি, কোলকাতা ১৯৩৩।

৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, কোলকাতা ১৮৯১।

৬। ইন্দ্রমিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, কোলকাতা ১৯৯২।

৭। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে ঃ উনিশ শতকে বাঙালী নারী, কোলকাতা ১৯৯৮।

৮। বসন্তকুমার সামন্ত, বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দু'টি মুদ্রিত গ্রন্থ, কোলকাতা ১৯৯৪।

৯। বিদ্যাদর্শন, সংখ্যা ৫, ১৭৬৪ শক।

The Nationalist Imageries and the Invocations of the 'Medieval' in Films from Maharashtra during 1920s"[1]

Dr. Urvi Mukhopadhyay
(Department of History)

The historiographical meaning of the 'nationalist' perspective numerous changes depending on the course of the nationalist movements in colonial India. One of the crucial paradigm shifts could be located in the context of the emergence of mass political movement during the late nineteenth and the early twentieth centuries when the mass presence in the national politics necessitated inclusion or at least recognition of metaphors and images outside the reaches of elite history, i.e. an enterprise of 'history' written in words. However, until recently, most of the sources for this study are limited within the boundaries of the print media that covers popular historical novels and drama to propagate the nationalist politics, making a phenomenon like mass mobilisation more difficult to explain. For example the printed materials of both the academic and popular in approach are helpful only in studying an extended literate-society, which includes some enclaves where written works were read out to a section of illiterate audiences. Not undermining the importance of the written words, this paper, expands the scope by bringing in a more popular medium like the silent historical films made in a similar context as source to analyse the effective use of nationalist imagery of the past. Here the emphasis is on the filmic representation of Shivaji, the seventeenth century Maratha leader. The films in focus are primarily historicals made by Maharashtra Film Company during 1920s. This was the period when a crucial transition from Tilak's style of mass-mobilisation to the Gandhian style of mass movement was taking place in nationalist politics, especially in Bombay presidency. This paper discusses the construction and establishment of a historical narrative on medieval period, exemplified at best in the so-called 'Shivaji Films' within the nationalist framework that reflected the dominant nationalist ideas of that period.

This paper investigates the process in two parts. The first part explores the nationalist political culture of early twentieth century Bombay presidency, mainly the areas that later formed the modern province of Maharashtra. Here the focus is on the emergence and

[1]This paper was presented in 'South Asia Culture Seminar', Portsmouth University, Portsmouth, UK, March, 2002.

establishment of a dominant historical narrative about Shivaji for the nationalist rhetoric. This study includes the period when Tilak appropriated this historical rhetoric for political mobilisation. A later revival of the similar rhetoric in a Hindu-nationalist garb at the moment when Gandhian attempts to float a new style or mass political rhetoric of Non-Cooperation Khilafat movement failed marks the end of this study. The second part devotes mainly to the problems of historical representation in films, primarily in the banner of the Maharashtra Film Company, the most prolific producer of historicals with nationalist messages. I intend to investigate the complex relationship between the dominant Gandhian brand of nationalist rhetoric and the continuing usage of Hindu-nationalist imagery in invocation of Shivaji in Maharashtra and would like to unearth the intriguing nature of the political culture in the regional against the national scale.

Part I

The anti-colonial nationalism, as Partha Chatterjee observes, 'creates its own dominion of sovereignty within colonial society before it begins its political battle with the imperial power'.[2] The method and motive of such enterprises were to define a 'self' in contrast to the colonialist 'other'. But this process of defining the 'other' was already there in the imperialist strategies to wedge the battle for hegemony in the colonial society mainly through historical narrative. Hence history became the chosen ground for the nationalist to counter the existing colonial hegemony. Contrary to the imperial narrative, which emphasised the decadent and disintegrating elements of Indian history, the goal of the nationalist invocation of a past was to define and prove historical continuity of the required elements to form a nation and later on a nation-state. The nationalist narrative of history, however, did not always represent an uncontested monolithic voice. Severe struggle for dominance over historical narrative was quite common in the Indian subcontinent where anti-colonial movements brought together different claims over the uses of the past to win dominance over political mobilisation. The localised nature of the urban elite and their respective socio-political demands bred diversity on the basis of regional issues within the national space.[3] A spectrum of diverse uses of the Indian past could be seen in the nationalist

[2] Parth Chatterjee, *The Nation and Its Fragments : Colonial and Post-Colonial Histories*, Princeton, 1993, p-6.
[3] Gordon Johnson, *Provincial Politics and Indian Nationalism : Bombay and the Indian National Congress 1880-1915*, Cambridge, 1973

rhetoric during the period when nationalism as an idelogy was still very much linked to the regional identities in a vast country like India.

A strong centre of nationalist politics developed in the region around Pune near Bombay. Here the nationalist metaphors were greatly inspired by the regional glory through invoking the Maratha past in late nineteenth century. Pune was the centre of Peshwai rule before it came to an end in 1818. Peshwas were the powerful ministers who ruled in the name of the descendants of Shivaji, the seventeenth century Maratha leader who curved out an independent territory within the Mughal state. A deep sense of loss of power and glory could be seen among the ex-ruling elite in Pune after the initial process of colonial administration began to take shape. But unlike the ex-Mughal elite, these people easily adapted themselves in the new situation and collaborated to the British rule mostly as civil servants. The majority of these people were instrumental in the formation of *Poona Sarbajanik Sabha*, the first political association that preceded the foundation of Indian National Congress in 1885. In 1879 Sir Richard Temple, the Governor of Bombay presidency, observed that these Maharashtrians believed that they would 'one day reassert itself over the white conquest'.[4] Temple described the state of feeling among this class as follows,

'Throughout the whole Deccan, the mind of the people is..... affected by the past associations of Maratha rule, which so far from being forgotten, are better remembered than would ordinarily be expected, and by the long-retained memory of the Maratha uprising against the Mahomedans..... this memory constantly suggests the analogy between the position of the British and that of the Moguls in the Deccan.'[5]

Interestingly, this analogy of a pan-Indian empire between the Mughal and British state was not a creation of the nationalist historiography, but of the imperialist narrative. Imperial historiography, however, was critical of both the Mughal and Maratha rule for being 'premodern'.[6] Mughal rule in Deccan specifically was relegated as an oppressive, despotic rule and was condemned for not showing tolerance to different religious communities in this narrative. But

4 Temple to Lytton, 9 July 1879.
5 Minute by Temple, 31 July 1879, quoted in *Provincial Politics and Indian Nationalism: Bombay and the Indian National Congress 1880 to 1915* by Gordon Johnson, Cambridge, 1973, p-54.
6 James Grant Duff, *History of the Marathas*, London, 1818.

during the late nineteenth century, the Marathas made a better ranking in the colonialist historiography when Elphinstone hailed Shivaji as the true leader of the Maratha people rather than a unsurper and rebel within the Mughal imperialist fold.[7] He first referred to Marathas as a 'nation' and Shivaji's activities as an example of 'war of independence'. This reading of Maratha history motivated the Marathi elite to rally around the historical figure of Shivaji as the role-model leader from the regional past.

First attempts to popularise Shivaji among the Maharashtrian masses, however, could be associated with social movements rather than the political one. The famous social reformer Jotiba Govindrao Phule composed and published a Marathi ballad with an alternative title in English, *Life on Shivaji in Poetical metre* where Shivaji was hailed as a non-Brahmin hero who championed the casue of the downtrodden masses in Maharashtra.[8]

But soon the icon of Shivaji was hijacked and incroporated into the mainstream maratha nationalist politics revolved around *Poona Sarvajanik Sabha* where political zeal overruled the ideal of social reform. In 1870s the famous Marathi litterateur Vishnushastri Chiplunkar insisted that 'the people should be educated and they should come to know principles of politics and they should once again inaugurate a golden era in this ill-fated country' in his famous essay on 'History' in the journal *Nibandhamala*. This characterisation of the 'golden age' of Maratha past requires an explanation as it pushed back the time period almost a century during the days of Shivaji than to a more recent Brahmin-dominated Pune-based Peshwai period. Probably this stance was taken in the face of growing awareness of the power of the mass politics to win the nationalist political cause on the part of the *Sabha*, dominated by the Chitpavan Brahmin caste interest. In spite of the overwhelming presence of them in the general body of the *Sabha*, this historical invocation was probably made to extend the social basis of this movement, by which Marathis from different caste groups could come and join this movement. However, this historical invocation situated the Peshwai period within a continuous tradition of political rule founded by Shivaji in Maharashtra to strengthen the elite Brahminical group interest.

7 Mountstuart Elphinstone, *The History of India: The Hindu and Mohametan Periods*, London, 1841.

8 Narayan H. Kulkarni, 'Shivaji Festival in Maharashtra' in B.K. Ahluwalia and Shashi Ahluwalia ed. *Shivaji and Indian Nationalism*, Delhi, 1984

during the late nineteenth century, the Marathas made a better ranking in the colonialist historiography when Elphinstone hailed Shivaji as the true leader of the Maratha people rather than a unsurper and rebel within the Mughal imperialist fold.[7] He first referred to Marathas as a 'nation' and Shivaji's activities as an example of 'war of independence'. This reading of Maratha history motivated the Marathi elite to rally around the historical figure of Shivaji as the role-model leader from the regional past.

First attempts to popularise Shivaji among the Maharashtrian masses, however, could be associated with social movements rather than the political one. The famous social reformer Jotiba Govindrao Phule composed and published a Marathi ballad with an alternative title in English, *Life on Shivaji in Poetical metre* where Shivaji was hailed as a non-Brahmin hero who championed the casue of the downtrodden masses in Maharashtra.[8]

But soon the icon of Shivaji was hijacked and incroporated into the mainstream maratha nationalist politics revolved around *Poona Sarvajanik Sabha* where political zeal overruled the ideal of social reform. In 1870s the famous Marathi litterateur Vishnushastri Chiplunkar insisted that 'the people should be educated and they should come to know principles of politics and they should once again inaugurate a golden era in this ill-fated country' in his famous essay on 'History' in the journal *Nibandhamala*. This characterisation of the 'golden age' of Maratha past requires an explanation as it pushed back the time period almost a century during the days of Shivaji than to a more recent Brahmin-dominated Pune-based Peshwai period. Probably this stance was taken in the face of growing awareness of the power of the mass politics to win the nationalist political cause on the part of the *Sabha*, dominated by the Chitpavan Brahmin caste interest. In spite of the overwhelming presence of them in the general body of the *Sabha*, this historical invocation was probably made to extend the social basis of this movement, by which Marathis from different caste groups could come and join this movement. However, this historical invocation situated the Peshwai period within a continuous tradition of political rule founded by Shivaji in Maharashtra to strengthen the elite Brahminical group interest.

7 Mountstuart Elphinstone, *The History of India: The Hindu and Mohametan Periods*, London, 1841.

8 Narayan H. Kulkarni, 'Shivaji Festival in Maharashtra' in B.K. Ahluwalia and Shashi Ahluwalia ed. *Shivaji and Indian Nationalism*, Delhi, 1984.

But soon the gloires of Shivaji's reign came into focus rather than the period of the Peshwai in their interpretations. Through this process Shivaji emerged as the icon of political aspiration of the Marathi elite. They interpreted historical figure of Shivaji as the role model of a leader who 'created a nation' that lasted until the defeat of marathas in 1818[9].

In 1890s academic enthusiasm around Shivaji as a historical figure reached its apex when the nationalist politicians of the 'moderate' fold in Indian National Congress like M.G. Ranade hailed him as the iconic figure behind the so-called seventeenth century Marathi political social and religious 'renaissance' that represented an incipient 'nationalism'.[10] Ignoring the fokd imagery of Shivaji as the incarnation of the Lord Shiva, he evaluated his contribution in a more secular and modern terms where his princely qualities to lead a nation was highlighted. Ranade interpreted Shivaji's reign as a precursor of a 'modern national rule' where governing principle was more to preserve the syncretic nature of the Maratha society than to build a nationl state guided by the Brahminical or divine regulations in reaction of the Muslim intolerance.[11]

Another trend of analysis portrayed Shivaji as the master of military strategy and a shrewd diplomat who was capable to resist a more powerful Mughal system. This position celebrated the military achievements of Shivaji and tried to inspire a radical way of winning the battle against imperialism through armed movements under an able ledership. An example of this sort of historical interest could be cited in a paper by R.P. Karkaria, which was presented before the Bombay branch of Royal Asiatic Society in 1894. This paper defended the killing of Afzal Khan, the commander of Bijapur by Shivaji as a mean to win 'the war of independence'. These narratives revived the traditional Marathi heroic folk ballad form of *powada* as a vital source of political and military 'history' rather than mere ' myth' that remained in the popular memory for ages. Historians like Parsnis took an initiative to collect this genre of literature and published in his journal *Kavyaitihasasangraha*. This journal also published modern heroic ballads and sense of 'national' glory among the literate and semi-literate Marathi society. Not only the heroic ballads, some family

[9] Setu Madhavrao Pagadi, 'A National Figure' in B.K. Ahluwalia *etal.* ed. *Shivaji and Indian Nationalism.*

[10] Stuart Gordon, *The Marathas 1600-1818*, Cambridge, 1998

[11] M.G. Ranade, *Rise of Maratha Power.* pg-13.

documents from the Marathi noble families were also collected and compiled to prove the conquest and political organisation of Maratha Empire. The most famous of these collectors was V.K. Rajwade, who published thousands of such documents in the journal *Marathyancha Itihasacin Sadhanen*.[12] To these scholars and collectors, Shivaji became the icon to win the political goal with the means of force. Some of the interpretation highlighted the *Kshatriya* nature of the movement with which the non-Brahminical elite tried to topple the Brahminical dominance in contemporary society. The Brahminical camp, on the other hand, did not contest the militant image of Shivaji but claimed that the Brahmin guru Ramdas was the real ideologue behind this aggressive ideology of the Maratha 'nation'. *Jagadhitecchu*, and orthodox Pune journal edited by one of the followers of Hindu orthodox leader Balasaheb Natu praised Shivaji for his uncompromising attitude towards the Muslims and his show of respect towards Brahmins, cows and the Hindu religion. This perspective obviously highlighted the religious character of Shivaji's reign.

Thus an interest about the 'glorious' reign of Shivaji was already there among the different brands of elite nationalist academicians when Bal Gangadhar Tilak commenced the Shivaji Utsav to invoke the glories of the pre-modern 'nation-state'. Even the colonial government became conscious about wide usage of the Maratha past and acknowledged its popular appeal by including small pieces on Shivaji in the government-sponsored school-textbooks be the end of the 1880s in Bombay presidency. This omnipresence of a political myth around Shivaji made the nationalists of different interest groups more active to appropriate this narrative to achieve their own political goal.

After the successful experiment with the mass mobilisation around the religious figure of the Hindu god Ganapati, Tilak took the initiative to plan an even bigger festival, which according to the historian Richard Cashman, would be enable him to reach to the 'grass-root' level to disseminate the idea of the Congress.[13] To bring nationalist politics and the Congress ideas more directly in the mass politics Tilak chose a popular political symbol, which directly appealed to communities outside the Brahminical elite. In the issue of *Kesari*

[12] V.K. Rajwade (ed). 'Marathyancha Itihasacin Sadhanen', Poona, 1898-1918
[13] Richard I. Cashman, *They Myth of the 'Lokamanya' : Tilak and Mass politics in Maharashtra'*, California, 1975, p-98.

dated 28 April, 1896 he wrote that Shivaji is the historical figure to 'whom all the differnt castes of Maharashtra could focus their loyalty'. He selected the community of non-Brahmin men of wealth and standing, the native princes and *sardars* with a historical allegiance to Shivaji to serve his purpose. These people also acted as the community leaders for the majority non-Brahmin Marathi-speaking population.

The first initiative to hail Shivaji as a Marathi hero however, was taken not by Bal Gangadhar Tilak but M.G. Ranade, the moderate leader and Tilak's political opponent within fold of Indian National Congress. Ranade as a historian, tried to rally the *sardars* and the citizens of Pune in 1885 for a petition to the local government to allocate funds to restore the samadhi *of Shivaji* in Raigarh. This precedence made Tilak more cautious in claiming his legitimacy in convening a public meeting for the restoration of Shivaji monuments and to arrange a permanent endowment, which would provide the necessary funds for an annual festival in Raigarh. Not directly contesting Ranade's moderate interpretation of the historical contribution of Shivaji, Tilak hijacked the organizational part in the name of the Congress, which he claimed to have a wider base of mass support than the party of Ranade, which only involved the social leaders. Tilak however, ensured the support of the native chieftains by offering post of the president of the Shivaji Fund Committee to the Maharaja of Kolhapur, the direct descendant of the Hero. By accepting the post, Maharaja of Kolhapur gave legitimacy to this new group under Tilak's leadership to undertake the movement around the historical figure of Shivaji.

The chieftains however, were not the main political clout that made this movement a success. The *Kesari*, under the editorship of Tilak, ran a successful campaign to enlist support of lesser figures by stating that no donation was too small and promised that every *pai* would be acknowledged in the columns of the *Kesari*[14]. This journalistic campaign stirred a massive enthusiasm among the literate and semi literate masses. By December 1895 the contributors of this category reached the ark of 60,000[15]. This established the popular character of Tilak's party, which was becoming crucial in the nationalist politics to exert the pressure on the colonial state at the turn of the nineteenth century. To achive this goal, Tilak explored

[14] Kesari, July 2, 1895.
[15] *Mahratta*, December 31, 1895.

the traditional communication forms like *Kirtan,* processions with flags and images in the style of religious processions, *powada* or folk ballads in the Shivaji festival held at Raigarh in 1896. This inclusion of all these of traditional forms from invoking nationalist past brought a change in the idea of political rhetoric. It became necessary in the nationalist rhetoric to add populist idiom and forms on the top of the essential nationalist content for tracing the historical unity of the 'national' society. From then onwards, the nationalist campaign, especially in Bombay presidency, looked beyond the printed words as a form to disseminate the idea of 'national past' among the larger section of the society.

Although Tilak maintained a moderate face to win legitimacy in the podium of the Shivaji Utsav in the initial stage, the populist anti-Muslim Hindu-nationalist comments found their way into the columns of the *Kesari.*[16] He utilised the Shivaji Utsav platform for bringing in all the divergent interpretations about the 'glorious past' and establish his faction's legitimacy to 'revive' similar condition in the comtemporary situation. Thus the Shivaji Utsav of 1896 legitimise all the forms and interpretations that went around the historical figure of Shivaji rather than legitimisning one dominant historical narrative.

Through this process the *powada* or the mythic tradition around Shivaji received an unprecedented legitimacy as a 'nationalist historical narrative'. Even the quotations about the heroic incidents cited in *powadas* were made their way in nationalist political rhetoric as the true history preserved in the memory of the masses. In 1897 Professor Bhanu of Fergusson College of Pune defended the incident of an attack on Afzal Khan in a similar tone of a heroic ballad, justifying Shivaji as 'the great man' who was 'above the comon principles of morality'.[17] The sympathetic tone of the report of this meeting in *Kesari* on the eve of British official Rand's murder made Tilak and Shivaji Utsav the targets of suspicion from the official point of view.

Thus the mass mobilisation as a political programme included popular idioms and metaphors in formulating the nationalist narratives. But this process was not a one-way traffic, which could damage the dominance of the elite in politics. In contrary, incorporation of more popular froms in political rhetoric helped to expand the dominance of the elite ideology to a wider extend. Contests between

[16] *Kesari*, May 28, 1895.
[17] *Kesari*, June 15, 1897.

the narratives regarding the issues like the 'national past' often made a compromise with the lesser narratives to preserve the dominance of elite nationalist interest. This trend continued even after the demise of Tilak who established this sort of contestation and compromise between different historical narratives to use the past to preserve the dominance of the minority elite in the organisation of the mass mobilisation.

As the mass mobilisation became the measuring stick for the political success, the mode of action for the nationalist politics changed drastically. It was no more restricted to the annual event of a political session of the social elites to frame their petition to the local governments, but a continuous network to reach and communicate to the masses. All-India scale of movements during the Gandhian era during later days favoured a more nation-wide symbol and idiom for mass rhetoric. It promoted the spirituality and syncretic tradition of the medieval Bhakti movement as the basis of Indian national unity. Thus the militant icon of Shivaji of Tilakan brand of regional nationalism lost its dominance in the face of a more wide-scale and popular historical image of Bhakti movement. These sorts of continuous negotiations with the popular images proved that nationalism as an ideology was becoming the dominant political culture of the colonial society. As a result of it, the popular forms of historical representations such as films became a zone where of different historical images and metaphors from various traditions made their way to capture widest possible audiences.

Part 2

The purpose of historical representation in films has been questioned time and again. Was there any conscious awareness within the film industry about the potentialities of the cinematic medium of use as propaganda for nationalist cause? Or was it because of the immense presence of the metaphors relating to the past in political culture that made to select historical topics into films in the background of nationalist movements? Some of these images and metaphors derived its origin from the 'history' as a discipline, but others have to be invented or borrowed from other forms of past recollection to make it more understandable to the audiences coming from different strata of the society. Apart from the audience factor, the importance of visual nature of the film also compels to include metaphors and stereotype about the specific past than sometimes have overlooked by written historical tradition built on 'data' and 'facts'.

Being strictly a visual medium during the silent period, films created the historical milieu with the help of images exemplified more by colours, costumes, space and gestures than the written words as historical evidence. Such a push outside the limits of written-history tradition makes the process something more than a direct translation from written words of vision. Thus the historical films made in nationalist context mirrored the dominant nationalist historical rhetoric of the elite leadership as well as the more popular images of the historical past mentioned in plebeian forms such as *pawadas* or ballads and bazaar art.

This paper discusses the historical films from Maharashtra region that pioneered in establishing historicals as a filmic genre during the silent era. A number of great names of Indian film industry including Baburao Painter, V.Shantaram, Bhalji Pendharkar, Baburao Pendharkar, S. Damle and Sheikh Fattelal started their career in this region and more specifically of Maharashtra Film Company. This company, however, was never a part of the official nationalist propaganda machinery. Founded in 1917 by an artist Baburao Painter with a homemade camera in Kolhapur, this company made a similar claim as of Phalke's Hindustan Films to make films of 'Indian topics'. This claim was made in a background of the growing nationalist dominance in the cultural sphere. A quest for an 'Indianness' in content and style became a major issue in popular as well as in the 'visual culture' at the turn of the century.[18] Artists and painters like Ravi Verma and Dhurander painted themes from Hindu mytholigies and history, which established the characteristics of the coveted 'Indianness' in popular representations. Baburao Painter, having an exposure to the on-going changes in the visual culture as in illustrator and set-designer for Gujrati Parsi Theatre and Sangeet Natak Mandali, associated himself in a similar project in the filmic medium. Apart from his background, Painter, like the other Indian film producers, wanted to associate himself with the nationalist campaign to secure their financial interests as well. The nationalist slogan from promoting Indian topics also helped the Indian industry to combat the big foreign film companies such as Pathe and United Artists who almost monopolised the distribution and exhibition network of the colonial countries including India. This campaign favoured the interest of the emerging Indian film industry, which was, otherwise, hugely

[18] Tapati Guha-Thakurata, *The Making of New 'Indian' Art : Artists, Aesthetics and Nationalism in Bengal, c1850-1920*, Cambridge, 1992

threatened by the big networks of European and American film comapnies.

Like the first few Indian film companies, Maharashtra Film Company was founded in a small town in Bombay presidency. Bombay city was yet to come up as the hub of film industry at that time. New ventures like film enterprise could not dare to set it first steps in the hardcore of the financial districts of Bombay. But the city of Bombay provided the first big audiences for such new ventures. Thus most of the early film companies chose a locale in the neighbourhood of the city, but not in Bombay proper. It is interesting to note that these film companies received its initial patronage from the traditional elite groups, mostly the native rulers of Maratha or Rajput origins. The perception of the film production was then very much linked with popular performance like traditional theatre rather than with industrial production. This perception of the film production perhaps played a role to earn patronage from the traditional ruling elite.

Thus Maharashtra Film Company was founded in Kolhapur with the patronage of the native ruler Maharaja Shahu (1894-1922) in form of a land grant in 1917. Baburao Painter started the journey of the company producing films on Hindu mythologies. Themes from the Hindu mythologies were regarded as the 'nationalist representation' in the contemporary political rhetoric because it involved a narrative and a plot that would be comprehensible to the Hindu majority audiences. His second film *Sairandhri* (1920) had an allegorical narrative about the hardships and cruelties in servitude and thus highly acclaimed as a 'swadeshi' film in the nationalist press. Tilak personally congratulated Baburao and hailed this film as an example of the nationalist film.[19]

His next film *Sinhagad* (1923) was the first instance of Indian historical genre.[20] The film is an adaptation from a popular novel of Hari Narayan Apte. It narrates the heroic incident of capturing Sinhagarh fort from the Mughals. The hero of the struggle was the local lad Tanaji Malusre, who proved his efficiency to Shivaji by implementing cunning military tactics, but he sacrificed his life for the cause at the end.[21] The story was taken from a *powada*, which

[19] Ashish Rajadhyaksha and Paul Willeman, *Encyclopedia of Indian Cinema*, New Delhi, 1994.
[20] *Ibid.*

became a popular theme for numerous novels and plays as well. The film *Sinhagad* was able to make an impression for its free-flowing narrative that easy to grasp among both the literate and illiterate audiences. Its realistic treatment with sets and light helped its audiences to experience the magical time of Shivaji, which contributed in rekindling the image of Shivaji as an icon even when a new leader Mohandas Karamchand Gandhi with a new rhetoric of passive resistance and non-violent movement dominated the political scenario.

The release of the film strangely coincides with the failure of Non-Cooperation and Khilafat movement and sudden rise of Hindu nationalist forces. The film, however, has no reference of Shivaji as the Hindu nationalist icon. It rather portrayed Shivaji as an adventure hero in the line of Hollywood historical adventures featuring Douglas Fairbanks. But the political context, when this sort of historical invocation was made, needs to be discussed here. Gandhian interpretation of the syncretic spiritual wholeness of the Indian past was seen as a utopia as the alliance between the Non-coopertionist and Khilafatists fell apart. In this sort of crucial juncture of the nationalist politics when the revivalist trends in nationalist historical rhetoric got a mileage due to a setback of the dominant Gandhian notion of the syncretic nature of Indian history. It was common in the region like Maharashtra to look back to the already existing nationalist icon of the 'glorious past' after the failure of the Non-Cooperation movement.

The success of *Sinhagad* generated interest to produce historicals about Shivaji in the celluloid. Dadasaheb Phalke made film on Shivaji's escape from the Agra fort known as *Shivaji-chi Agrahum Sutaka*, the same year. This episode from Shivaji's life was also well known through a mass of popular literature. A survey undertaken as a part Cinematograph Committee Report of 1927-28 shows that there was a high demand for the historicals in cinemas in Bombay suburbs such as Gorgon, Parel and Dadar where the majority of the audiences were illiterate or half-literate Hindus.[22]

The next film from Maharashtra Film Company *Kalyan Khajina* or *The Treasures of Kalyan* (1924) also featured the exploits of Shivaji, Baburao Painter shot most of the film in a realistic set of a cave

[21] Hari Narayan Apte, *Gar Ala Pan Sinha Gela*, Pune, 1890s.

[22] From the 'written evidence of Rao Sahib Chunilal G. Munim' to Indian Cinematograph Committee (1927-28), Vol-1, Calcutta - 1928

where the meeting between Shivaji and the Subedar of Kalyan is said to have taken place. This film was also based on a popular *powada*, which had incidentally been sung on the platform of Shiva festival in 1906.[23] The film hailed Shivaji for his honourable treatment of captured Muslim zenana in the battle against the Muslim Subedar of Kalyan. Here the controversial issue of the Hindu nationalist forces of so-called Muslim atrocity towards the Hindu women was, however indirectly addressed through the chivalrous representation of the Hindu ruler Shivaji. Audience received this film more as a quasihistorical adventure film with thrills and splendour of Maratha life than anything else.

Unlike *Kalyan Khajina*, *Poona Raided* (1924) from the rival Deccan Pics of Pune openly portrayed Shivaji as the Hindu-nationalist icon. Here, Shivaji's life is depicted as a source of inspiration for a militant nationalist struggle rather than a canvas to churn out adventure stories. The director Mama Warekar, was already known as a major playwright in the Pune stage, when he brought modern style to end the traditional theatrical form of *Tamasha*. This film retold the legendary episode, a favourite of numerous historians of the Maratha glory, of Mughal emperor Aurangzeb's attack on Pune and how Shivaji repelled it. *Poona Raided* also focussed on the fact that this film featured 'educated actors' not the traditional entertainers who has got the command on the subject to 'mark a new era in the Indian film industry'.[24] This conscious effort to legitimise the supremacy of the propagated historical version by virtue of the education was a common phenomenon for the upper class Hindu-nationalist trends, but was new for Indian film industry.

The Hindu-nationalist quest for inspiration from militant historical icon was not only prevalent in Maharashtra. Soon the Rajput legends celebrating chivalry and sacrifice were revived to emphasize the importance of militant resistance to the attacks on Hindu national culture. The Hindu Mahasabha, Arya Samajists with Sanatan Dharma Sabha and Rashtriya Provinces respectively. Though Gandhi issued public statements against the folly of these sorts of militant communal objectives in *Young India*, he however, never broke with the Hindu nationalist leaders like Madanmohan Malaviya and Purushottamdas Tandon. In this context Baburao painter made his next two films on the Rajput legends, first on Padmini called *Beauty of Rajasthan* or

[23] Mahratta, 29 April, 1906

[24] *The Times of India*, 12 August, 1924.

Siege of Chitor (1924) and the next called *Rana Hamir* (1925). In the case of the first film two titles represent the two ways of imagining the pre-modern incident. One emphasizes the element of romance; the other highlights the spectacle of sacrifice, which was so relevant in the comtemporary Hindu nationalist rhetoric. Painter's nest film *Rana Hamir* also celebrated the theme of regaining the throne from the 'foreign' Muslim occupancy.

These films were generally showed in cinemas Bombay suburbs and in towns like Ahmednagar, Kolhapur, Nasik and Satara where the population size was at least 25000 in Bombay presidency.[25] These films had a huge audience among the literate and illiterate Hindu masses coming from middle to under classes of the society. Rural society was still beyond their reach as the rural network through tent theatres were generally controlled by either the distribution chain of big brands like Pathe through Madan Theatres or managed by small tent theatre companies who produced low budget films independently for their own exhibitions.[26] Maharashtra Film Company had a large following and reputation for producing 'quality pictures' for its content as well as style among the urban and semi-urban dwellers. In his oral evidence to the Indian cinematography committee survey of 1928 a spokesman of a Hindu nationalist group called Aryan Excelsior League, praised these sorts of historicals from the Maharashtra Film Company as 'the biggest crowd-puller' in Bombay suburbs and smaller towns which 'leave(s) a lasting impression' for its commitment to history.[27]

This viewpoint was, however, not reflective of the general educated filmgoers' reaction. Most of them were still to be convinced with the authenticity of the history that went in the name of 'historical films'. A group of educated elite doubted the legitimacy of handling a historical subject because 'most of the people involved in Maharashtra Film Company are from the lower classes with little educational background'. In 1927 V. Shantaram made *Netaji Palker* based on a biographical sketch of a Marathi general of Shivaji, which was read as a school text during that time. It was released by Majestic cinema

[25] From the 'Oral Evidence of N.B. Desai, A.M. Irani and others before the Indian Cinematograph Committee of 1927-28', Vol-1 Calcutta - 1928, p-171

[26] *Indian Cinematography Committee Survey Report* 1927-28, Vol-I, Calcutta, 1928, p-171

[27] *Indian Cinematography Committee Survey Report 1927-28, Vol-I, Calcutta, 1928, p-145*

in Bombay just before the commencement of Matriculation Examination that year and was described as 'an educational film' for the student community for its vivid description of the historical episode.[28] Thus a claim from authentic historical representation was also made to reach the educated section of the society who initially was not the original client of the company.

Thus historical films of Maharashtra Film Company tried to reach out to all sections of the society where the notion of historical past had already existed in virtue of nationalist political culture associated with historical invocations. But the central icon of these invocations varied a lot from region to region. These Shivaji films had a very limited market even in the non-Marathi speaking areas of Bombay presidency, such as in the Gujarati speaking areas. These films however, contributed in inspiring a demand for portrayal of regional 'nationalist' past in the filmic medium. In his oral evidence before the Cinematograph Committee of 1927-28, the director of the Information Bureau, Panjab, Khan Bahadur Khan Nawab Muzaffar Khan expressed his frustration for not showing historical episodes from Punjab's history as matter of 'national' past. This identification with the past by common people, he claims, should be the basis of 'national' history.[29] This demand was further confirmation of the aspired populist nature of the nationalist historical rhetoric that tried to represent all the regional interests in the wake of nation-wide mass political movements.

This aspired nature of the nationalist historical narrative with the balanced view towards all the regional, community, class and linguistic interests were yet to be achieved in reality. There was a definite imbalance in the historical and political narrative in favour to the dominant majoritarian interests. Even the popular historical representations such as films were not out of this dominance. A report in the *The Times of India* in 1928 focuses on the problems of the communalism in films titled 'Films and Communalism'. The report treats the representation of the so-called 'Islamic period' where both extremist communal camps tried to tamper the historical truth. It reports that the Muslim League mouthpiece *Ittehad* criticized to the 'defamed' depiction of Muslims against the 'exhalted' representation of Marathas by a 'new school of historians in Maharashtra' who are

[28] *The Times of India*, 2 April, 1927
[29] *Indian Cinematograph Committee Survey Report* 1927-28, Vol-II, Calcutta, 1928

deliberately manufacturing false history and propagating it through books, plays and films.'[20]

Conclusion

Historical as a genre lost its prior importance with the coming of sound films in 1930s. A genre of religious biographies called 'Sant Films' emerged as the genre to define the 'national society' in a background of Gandhian movements against violence and castism in Indian society. Gandhian historical outlook promoted the 'unchanging' 'traditional' characteristics of 'sefl sufficient village communities' in India. This viewpoint directly confronted with the nation of the 'glorious historical period' revolved around a specific historical character. The promotion of this preception of the past also helped Gandhi to handle the problems of regionalism in formulating the common minimum programme for an all-India mass political movement. The nationalist historical rhetoric around a heroic political image could, however, retain its dominance in the vernacular press and regional language films. But these regional films, espeically the Marathi films with Shivaji stories lost its competition with the Hindustani films made from Bombay as the all-India film industry for a nation-wide market started to develop there during 1930s. Main artists and technicians like V. Shantaram, Fattelal, Damle and Pendharkar left Maharashtra Film Company and Kolhapur and set up a new Company called Prabhat in Pune which later on moved to Bombay. In its initial stages Prabhat Film Company made some remakes of the films from Maharashtra Film Company. But from 1935 it chose to produce the Sant films, which suited more with the dominant political rhetoric of the time.

[20] *The Times of India, 25 January 1928.*

Science

Biotechnology and Society in the Twenty-first Century

Dr. Debasish Pal
(Department of Zoology)

We are in the early stages of a major revolution in life sciences and biotechnology that will impact on every aspect of our society. The major benefits on the horizon will only be realized if society accepts biotechnology and resulting products as ethical and safe.

Over the past several years, I have tried to realize the social acceptance of biotechnology. On one hand, consumers want to know what's in it for them. On the other, they want to know that credible institutions are carefully considering what society stands to gain or lose from new developments. One reaction is to ban certain areas of scientific research. Just as troubling would be to let the market sort out the winners from the losers in the usual fashion. We need a middle path to biotechnological development.

Since universities have played a major role in the development and promotion of science and technology, we also have an obligation to help society understand and manage the changes that arise from biotechnology and genomics. We must ensure that our knowledge and tools are used ethically and safely.

These issues require the full range of disciplines within the university. A significant expansion of social science research will be needed to elucidate the full range of views from our complex global society. Such research will also shed light on the information gaps that scientists must bridge when trying to talk with consumers. The impact of such an integrated approach will be enhanced public understanding with trust and support for our scientific institutions. With a holistic focus on the full range of boitechnology applications, we hope to provide societal leadership as we enter the Century of Biology.

Introduction to the appraisal of results

The last few years have witnessed a surge in biological research that has unleashed a myriad of practical applications in many areas of activity (namely, health care, pharmaceutics, agriculture and the agro-food system, chemistry, environmental protection, information technologies), through both the delivery of innovative products and

the adaptation of existing products into more competitive ones.

The growth of such permeating activity, however, which impacts on numerous aspects of social organization, has not been paralleled by efforts to convey correct and unbiased information to the general public, which is increasingly involved in choices of both a regulatory and a behavioural nature.

Knowledge of the development opportunities made possible by biotechnologies assumes growing importance, given the natural research — innovation transfer — product marketing cycle. This complex scenario necessarily conditions policy decisions that must be made, as well, emphasizing the need to assure a 'biotechnology culture.'

Some of the issues raised by advanced biotechnologies, briefly outlined below, urge up-todate and in-depth reflection.

Biotechnologies conditioning the quality of life : medicine, agriculture, animal husbandry, energy and environment

The political debate arising in recent years in developed countries focuses on the protection of our environmental heritage, on the exploitation of renewable, non-polluting energies, and on degradable materials dispersed in the environment.

Productive and occupational development

Biotechnologies must be viewed as an emerging industry, enabling the development of new products or the set-up of new methods for the production of already existing, but scarcely available, ones, such as human proteins or other complex molecules.

Biotechnologies thus constitute a viable instrument that can offer the productive system the results and outcomes of a more targeted and rational organization of those factors underlying the innovation process, namely, research activity, technology transfer, training, access to funding and capital, in order to stimulate the creation of new industrial sectors.

Confirmation of this potential seen in the global sales of biotechnological products that, in the last few years, have experienced an overwhelming growth. Expectations, moreover, point to considerable increases for the year 2000-2005.

Directly linked to the productive and economic development potential of biotechnologies are its employment opportunities. Most

of the professional figures operating in the field, be they technicians or researchers, will require targeted measures of continuing education and training, biotechnologies being a rapidly developing, science-based discipline. Managers must be contemplated, as professional figures needed to link research breakthroughs with technological innovation and industrial development, in order to foster exploitation of research results, also through the detailed knowledge of markets and their demands.

Cultural revolution and public perception

Biotechnologies represent one of the technological revolutions of this century, introducing radial changes in the way many problems regarding human health, agricultural and zootechenic production and environmental protection are faced and dealt with. Biotechnologies have undoubtedly raised challenging environment-related, ethical and social issues that demand an open forum.

For this reason, the European Union has long supported the activities of the European Initiative for Biotechnological Education (EIBE), whose aim is to devise innovative teaching materials, including laboratory experiments, models of DNA, RNA and proteins, and cartoon strips illustrating biotechnology methodologies, to circulate to middle and high school students throughout Europe.

Moreover, EIBE seeks to improve the general public's perception of biotechnologies, in order to stimulate informed debate, to facilitate teachers' access to biotechnology training, information and resources, and to reflect on the environmental, economic, ethical and social problems posed by biotechnologies.

Culture and education are pivotal to progress, competitiveness and employment, and are vital for individual growht. However, these must not be limited to random periods of learning, but rather, be viewed as permanent features of the pathway of human knowledge, from scholastic education to professional training.

Overall, the public perception of biotechnologies is more favourable toward health care applications than toward agro-industrial uses.

An opinion poll on the public perception of biotechnologies showed that there is no correlation between knowledge and acceptance, and that risk is less significant than ethical acceptability.

Researcher's moral responsibility

The professional ethic of researchers, which perhaps has never been written, regards above all academic activity. This kind of self-ruling imposes on researchers, for instance, the right/duty to promptly and objectively publish their results and to freely circulate not only ideas, but also the methods enabling others to reproduce their experiments. At the same time, moreover, this set of values discourages the excessive, often careless, if not outright negligent use of inappropriate means to disseminate research findings, e.g. press releases or interviews.

By the same token, these releases, rather than acknowledge scientific conferences or seminars, are increasingly used in order to exploit the utmost expected or preliminary results. At times, for reasons of personal prestige or for access to research funding, scientists readily divulge findings of premature nature or inflated value to the mass media, inciting as a consequence alarm in the population.

At the same time, the scientist's refusal to comment or to take a stand on the meaning of information ensuing from research is counter-productive.

Another problem regards the need to find the right balance between the approach of the US, which reveals a dangerous confusion of roles between university professors and entrepreneurs, and that of Europe, which shows a penalizing distance between the academic community and industry.

Nevertheless, the most important and widely sensed issue regards the deliberate intervention on living beings through genetic engineering techniques : indeed, because this problem is the most pressing and most far-reaching in scope for humankind, the informed debate on how to handle it cannot be postponed.

Legislation

Biotechnology, through the genteic modification of living materials, has provided humankind with the means to face problems that were previously considered insurmountable. In turn, however, as these novel possibilities have led to the need for a new ethical framework, they also compel specific legislative provisions. After years of debate and controversy, the problem of the legal protection of living materials was at last settled in the European Community in May, 1998, when the European Parliament issued the Directive on

the legal protection of biotechnological inventions. This Directive does not modify the existing regulations (European Patent Convention - EPC), but only provides the specific ethical and legal limits with regard to the matter of the appropriateness of the living mateiral. The content of the document recently approved in the EC - that has to be implemented by each Member State — provides the general principles of the patentability of living material, but expressly excludes the patentability of human beings, processes of modification or cloning of genetic germinal identity, commercial utilization of human embryos, processes of modification of the genetic identity of animals that may cause suffering that is purposeless for humankind, animal species or vegetable varieties.

Other European regulations existing since 1990 concern both the protection of workers exposed to biological agents (Directive 90/679/ECM implemented with Italian Legislative Decree n. 626/94), the use of genetically modified micro-organisms (GMMOs) (Directive 90/219/EC implemented with Italian Legislative Decree n 91/93) and the deliberate release of genetically modified organisms (GMOs) (Directive 90/220/EC, implemented with Italian Legislative decree n. 92/93).

Biodiversity

The term biodiversity defines the variety of life-forms that surrounds us : mammals, birds, reptiles, amphibians, insects and other invertebrates, plants, fungi and micro-organisms like protists, bacteria and viruses.In 1992, a summit held in Rio de Janeiro drew more than 150 leaders from nations throughout the world. On that occasion, an International Convention on biodivesity was stipulated in the belief it is necessary to take measures to halt the loss of animal and plant species, as well as genetic resources.

Scientific and technological progress enables man to intervene on natural selection and on genetic characteristics. Admittedly, this potentially leads to faster evolutionary changes; on the other hand, biotechnology allows for the safeguarding of our natural heritage by means of genetic data banks, where animal and vegetable species and varieties can be preserved for the future.

• ***This article is indebted to a number of Scientists, Social-reformers and Institutions.***

Some Selected Heterocyclic Compounds

বীরেশ্বর মুখার্জী
রসায়ন বিভাগ

এই প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় হ'ল কিছু প্রয়োজনীয় যৌগ।

Organic Chemistry জৈব রসায়ন, এটি বিশাল, বিরাট একটি বিষয়। একে 'বিষয়ে'র থেকে 'ভাষা' (language) বলাটা মনে হয় আরও ভালো হবে। যেমন D.J. Gram বিষয়টি এভাবে দেখিয়েছেন —

"In a sense, Organic Chemistry is a language, with compounds as words, reaction as grammer, sequences of reacting compounds as phrases and synthesis as composition. Clearly, solutions of synthetic problem rest squarely on a knowledge of structure and reaction, just as composition depends on vocabulary and grammer. Just as clearly fluency comes with practice and experiences as much in Organic Chemistry as in any language."

তবে জৈব রসায়নের সব ভাষাই যে মানুষ বোঝে তা কিন্তু নয়। যেমন ধরা যাক আমাদের শরীরে DNA ও RNA যে ফিতে (Double Helex or single Helex) আছে তার উপর লেখা আছে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রোগভোগের আগাম বার্তা ইত্যাদি। ভাষাটা লেখাও কিছু Heterocyclic Base দিয়ে। যে সংকেত (code) গুলো বহন করছে তাকে পড়তে পারলে (decoding) প্রাণ সৃষ্টি থেকে শুরু করে সব জৈবিক ক্রিয়াকর্মগুলো বলা সম্ভব। সেটা ঠিকমতো পড়তে পারলে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে বলে দেওয়া যায়। মুশকিল হলো এই ভাষার পাঠোদ্ধার করা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে, বেশিরভাগটা এখনো আঁধারে রয়ে গেছে। আজকে আমরা কিছু Heterocyclic কম্পাউন্ড সম্বন্ধে আলোচনা করবো। জটিল রাসায়নিক সমীকরণের মধ্যে না গিয়ে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বিস্ময়কর, এবং গুরুত্বপূর্ণ Heterocyclic যৌগ-এর মধ্যে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রাখবো।

শুরুতে কিছু সাধারণ Heterocyclic যৌগের কথা বলি। — যেমন

Fig : 1

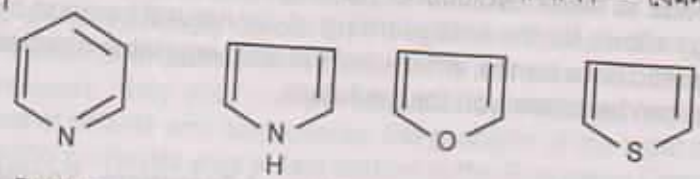

Pyridine Pyrrole Furan Thiophene

যৌগগুলি কোলটার (coalter) থেকে নিষ্কাসিত (extract) হয়।

অ্যাডিনাইন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং ইউরাসিল এগুলি ক্ষারীয় পদার্থ, যে গুলি কোষের নিউক্লিক অ্যাসিডে থাকে। এগুলির সজ্জা (sequence) গুরুত্বপূর্ণ জিনগত সংকেত বহন করে। যেমন এই ক্ষারের নির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য কোন নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহে সংশ্লেষিত হয়।

Fig : 2

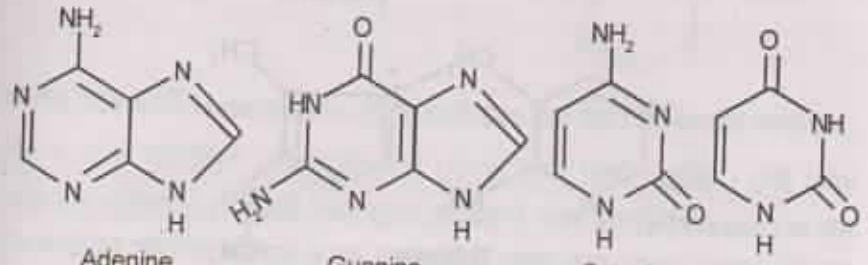

উদ্ভিদদেহে নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারকে অ্যালকালয়েড বলে। এই Alkaloids এর মধ্যে কিছু কিছু বিষাক্ত, আবার কিছু কিছু থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ তৈরী হয়। কিছু কিছু মাসরুম (mushroom) থেকে সিনোসাইবিন (Psinocybin) নামে একটি alkaloid আবিষ্কৃত হয়েছে। যৌগটি বিভ্রম সৃষ্টিকারী (hallucination) এবং মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটায়। পদার্থটির সংকেত নীচে দেওয়া হলো —

Fig : 3

আর একটি একই রকম যৌগ হলো LSD (Lysergic acid diethylamide)। যৌগটি এরগট্ (Ergot) ছত্রাকে গম বা রাই অথবা ঘোড়ার দানারূপে ব্যবহৃত শস্যর উপর জন্মাতে দিলে লাইসারজিক অ্যাসিড পাওয়া হয়। অ্যাসিড থেকে খুব সহজেই এর ডাই ইথাইল অ্যামাইড (diethylamide) প্রস্তুত করা যায়। যৌগগুলি অবশ্যই নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য।

এবারে আমি আমাদের পরিচিত কিছু ভিটামিন যেমন - নিয়াসিন, থাইয়ামিন-B_1, এবং রিবফ্লোরিন-B_2 (riboflarin - B_2), কিছু পুষ্টিকারক যৌগের উল্লেখ করব।

Fig : 4

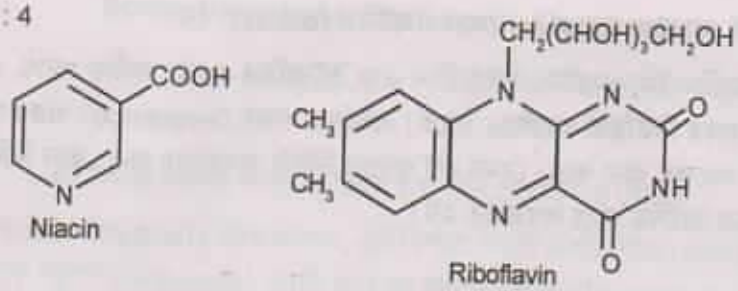

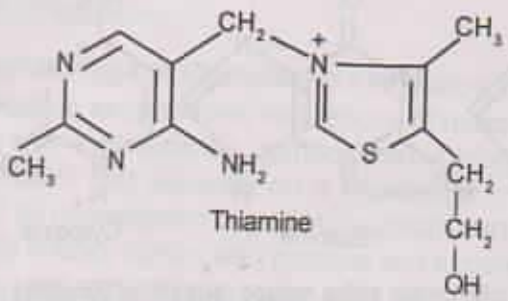

Heterocyclic যৌগ সংখ্যায় আর জৈবিক ক্রিয়ায় (Biological action) অসীম। আর কয়েকটা যৌগ দিয়ে আলোচনা শেষ করবো।

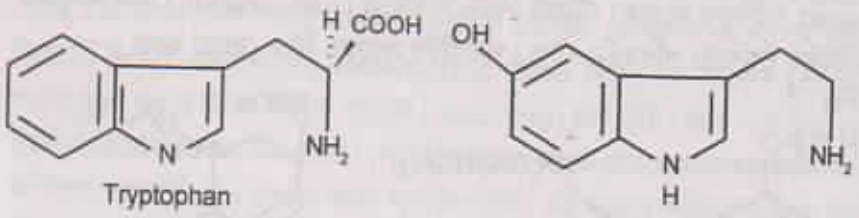

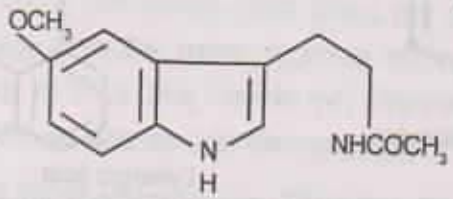

ট্রিপটোফেন (Tryptophan) একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড। প্রাণীদের শরীরে ট্রিপটোফেন থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ সংশ্লেষিত হয়। একটি হলো সেরোটোনিন (Serotonin) এটি একটি vesoconstrictor এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে nurotransmitter হিসাবে কাজ করে। মনে করা হয় melatonin দিনরাত্রির

শারীরবৃত্তিয় কার্যগুলির মধ্যে ছন্দোবদ্ধতা আনতে সাহায্য করে। যৌগগুলির আকৃতিতে Indole অংশটি বর্তমান।

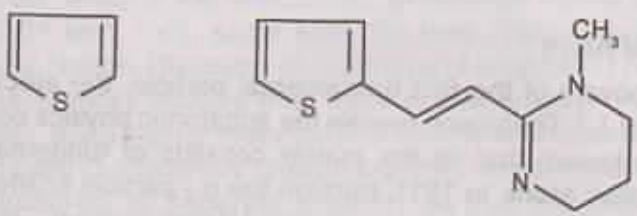

প্রসঙ্গত আর একটি Heterocyclic যৌগ-এর উল্লেখ করা যায়। আবিষ্কারটি আকস্মিক। ১৮৮২ সালে বানিজ্যিক বেঞ্জিনকেই ধরে নেওয়া হতো বিশুদ্ধ বেঞ্জিন। সেই সময় বেঞ্জিনের পরিচায়ক পরীক্ষাটি করা হতো বেঞ্জিনের সঙ্গে ইজাটিন (Isatin) ও ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে নীল বর্ণের দ্রবণ পাওয়া গেলে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Victor Meyer স্নাতকস্তরে Practical ক্লাস নেবার সময় বেঞ্জিনের পরীক্ষাটি তাঁর সহকারীকে (Lecture assistant) হাতে কলমে দেখানোর জন্য করতে বলেন। টেষ্টটিউবে যৌগগুলি মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হলো। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো এক্ষেত্রে কোন রঞ্জকই উৎপন্ন হলো না। ক্লাসে উপস্থিত ছাত্ররা ব্যাপারটা মজার বলে হাসাহাসি করতে লাগলো। Professor Meyor বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা কেন হলো? পরে জানা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বানিজ্যিক বেঞ্জিন সরবরাহ ছিলো না। সহকারী প্রশিক্ষক ক্লাসটা নেবার জন্য তড়িঘড়ি করে বেঞ্জইক অ্যাসিডকে (Benzoic acid) ডিকার্বক্সিলেশন করে Benzene বানিয়ে সেই বেঞ্জিন দিয়ে ক্লাসটি নিচ্ছিলেন। Professor এর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে বানিজ্যিক বেঞ্জিনে কোন অশুদ্ধি (impurity) থাকার জন্য অর্থাৎ Isatin-এর উপস্থিতির জন্য ঐ নীলবর্ণ আসছিলো। পরবর্তীকালে জানা গেল বানিজ্যিক বেঞ্জিন বিশুদ্ধ নয়। এর সাথে মিশে আছে নতুন একটি যৌগ থাইওফিন (Thiophin) ব্যানমিনথ্ (Banminth) যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃমিনাশক (an thelminth) হিসাবে পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

Ref : - i) Heterocyclic Chemistry – Joule & Smith.
ii) Organic Chemistry – Pine, Henderickson, Gram, Hammond
iii) Principles of Modern Heterocyclic Chemistry – L.A. Paquette

Wandering in the World of Particles

Dr. Lina Paria
(Department of Physics)

• Structure of Atom :

The discovery of the first fundamental particle, the **electron** (e^-) in 1897 by J.J. Thompson reveals the subatomic physics before which it was known that all the matter consists of fundamental particles – called **atom**. In 1911, through the α - particle scattering experiment, Lord Rutherford discovered the "*atomic nucleus*" – which is the central massive core of the atom. The electron structure of the atom was understood before even the composition of its nucleus was known. The reason is that the forces that hold the nucleus together are vastly stronger than the electrical forces that holds the electrons to the nucleus in an atom. So it is much harder to break apart a nucleus to find out what is inside !!

Later on, in 1932, the discovery of neutron (n) by Chadwick, established the fact that the nucleus of the atom consists of positively charged **proton** (p) with mass 1836 times the mass of the electron (i.e. $m_p \sim 1836\, m_e$) and uncharged **neutron** with mass slightly greater than that of the proton. Neutron (n) and Proton (p) are jointly called **nucleon**.

Now the problem is that what keeps an atomic nucleus despite the repulsive coulomb forces one proton exerts on another proton? In 1935, the Japanese physicist Hideki Yukawa proposed that particles with mass $\sim 200 m_e$ are exchanged continuously between the nucleons and hence responsible for the nuclear forces which are repulsive at very short range as well as being attractive at greater nucleon - nucleon distances. These new exchanged particles - called **π - meson** or **pion** - which can be charged (π^+, π^-) or neutral (π^0) and are members of a class of elementary particles – collectively called **mesons**. After the experimental discovery of pions in the cosmic ray detector in 1947, Yukawa the first Japanese received the Nobel prize in 1949. As we know, partilces having spin (0,1,2, ... etc.) follow the Bose-Einstein statistics - called **bosons** and those having spin ($\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$...etc.) follow the Fermi - Dirac Statistics – called **fermions**. So electron (e^-), proton (p) and neutron (n) having spin $\frac{1}{2}$ are fermions whereas pions (π^+, π^-, π^0) having spin 0 are bosons.

• **Positron :**

Analysing the tracks of the cosmic rays in the cloud chamber, Anderson discovered the **positron** (e^+) also called **positive electron**, which is the *antiparticle* of electron having same mass (m_e~0.51 MeV / c^2), same spin, life time (stable) and equal but opposite charge. Discovery of positron and antiproton ($\bar{p}$) and some other evidences indicate that, there is a symmetry in the world of particles, such that for every particle there is an antiparticle. When a particle and its antiparticle brought together, they annihilate each other (disappeared as separate particle) so that the mass of these particles are converted into the energy of the *radiation*.

• **Photon :**

The quantum of radiation that travels with the velocity of light is called photon (γ). The *particle concept* of radiation thus introduces **photon** (γ) as a elementary particle, which is neutral (no charge) having zero rest mass and spin 1. Photons are exchanged between charged particles during their electromagnetic interaction – which is one of the *four* fundamental interactions (*strong, electromagnetic, weak and gravitational*) responsible for all the physical processes and structures in the universe on all scales of size from nucleon to galaxies of stars.

• **Graviton :** Particle exchanged in the gravitational interaction is called **graviton** - Graviton – which is *yet to be discovered* experimentally – has zero rest mass, spin 2 and moves with velocity of light.

• **Intermediate Bosons :**

The carriers of the weak interactions are called **intermediate bosons** (W^+, W^- and Z^0). These particles are massive (more than 80 times the proton mass), have spin 1 and decays in time ~ 10^{-25}s. The experimental discovery of these particles at the CERN laboratory in Geneva in 1983, confirms the theory of electroweak interactions (**Glashow - Weinberg – Salam Model**) which unites both weak and electromagnetic interactions together.

• **Lepton :**

The observed electron and positron emission from the heavy radioactive unstable nucleus to become more stable one - demands for the existence of another particle called **neutrino** ("little neutral one") and its antiparticle **antineutrino**. **Muon** and the neutrino associated with it were first discovered in the decays of charged

pions (in cosmic radiation)

as $\pi^+ \rightarrow \mu^+ +$ muon-neutrino

$\pi^- \rightarrow \mu^- +$ muon-antineutrino

These muons with mass ~ 105MeV/c^2 and with relatively long life-time (~10^{-6}s) decays into electron and *neutrino antineutrino* pair as $\mu^+ \rightarrow e^+ +$ electron neutrino + muon-antineutrino

$\mu^- \rightarrow e^- +$ electron anti-neutrino + muon-neutrino

Another elementary particle called **tauon** (τ) with mass ~ 1784 MeV/c^2 and its associated **neutrino** were discovered in 1975. All taus are charged and very short-lived (life time ~10^{-23}s), which decays into electrons, muons or pions along with appropriate neutrions.

All the three types of neutrions **electron-neutrino**, **muon-enutrino** and **tauon-neutrino** discovered are stable, charge neutral, having spin ½ and zero rest mass.

These six discovered particles – **electron** (e^-), **muon** (μ^-), **tauon** (τ^-) and their neutrions : **electron-neutrino**, **muon-enutrino** and **tauon-neutrino** are grouped together and called as **Leptons**. All these leptons seem to be truely elementary in nature with *no hint of internal structures*. Leptons interact weakly with other particles and are not affected by the strong interaction.

• Meson :

About the meson family we have discussed only about **pions** (π^+, π^-, π^0). Some other mesons were subsequently discovered – e.g. K-mesons or **Kaons** (k^+, k^0, k^-), **eta-meson** (η^0), **rho-m** (ρ), **Omega-meson** (ω^0) and **phi-meson** (φ^0). All these mesons (having spin 0 to 1) have large masses (ranging from ~ 490 Mev/c^2 to 1060 Mev/c^2) and a very short life time (ranging from ~ 10^{-20}s to 10^{-8}s) which decays into some other particle (leptons and photons).

• Baryon :

A large number of short-lived particles heavier than nucleon (with mass ~ 938 MeV/c^2) were produced in high energy accelerators and are also observed in the interactions of high energy cosmic radiations. These unstable (life-time ~ 10^{-20}s to 10^{-10}s) particles are **lambda** (Λ^0), **Sigma** (Σ^+, Σ^0, Σ^-), **Xi** (Ξ^- & Ξ^0) and **Omega** (Ω^-). These are collectively known as **hyperon** with spin ½ or 3/2 and masses ranging from ~ 1116 MeV/c^2 to 1672 MeV/c^2. Nucleon and hyperon together are known as **baryon** where as meson and baryon together are also termed as **hadron** (Greek- *heavy, strong*) as they are strongly

interacting particles.

• Quark :

Analysing certain properties of meson and baryon in 1963, Gell-Mann and Zweig independently proposed that hadrons are made of still smaller particles – called **quark** (the name **quark** borrowed by Gell-Mann from a line in a book by James Joyce). For each quark, there is also an antiquark. There are six-types (flavours) of experimentally verified quarks - named **up** (u), **down** (d), **strange** (s), **charm** (c), **bottom** (b) and **top** (t). All these massive quarks have spin y_2 and fractional charge (+ 2/3 or – 1/3 of electronic charge). Each of six types of quarks are given three distinct **colours** (properties) as *red, blue & green* (which has nothing to do with real colours). Each baryon composed of three quarks, whereas each meson composed of one quark and one anti-quark together. The strong interaction between quarks is due to the exchange of eight - types of particles - called **gluon**. Gluons are massless (with spin 1) which hold quarks together to form neutron, proton etc.

After all these discussions, we see that whatever was beleived to be elementary (atom) is no more elmentary. But atom has its internal structure and made up of electron (e^-), neutron (n), and proton (p). All though electron is an elementary particle (with no internal structure) but neutron and proton are not so. Both neutron and proton have their internal structure and consists of more elementary point-like particle-quarks linked by gluons.

• Tachyon

Tachyons are *hypothetical* particles which moves faster than light and must have imaginary valued mass but real valued energy. Although tahyons appear in some theoretical calculations, but *no tachyons* have been found experimentally as yet. While most physicists have doubt their existence, tachyons became more and more popular mostly from the fact that they are used so often in *science fiction*. We conclude this article quoting few lines by Reginald Buller about this interesting particle as :

There was a young lady named Bright
Whose speed was faster than light.
She went out one-day,
In a relative way,
And returned the previous night !!

HAZARDS OF THE SILICON FIBRE

Dr. Ratna Bandyopadhyay
Lecturer in Chemistry

Let me raise a valid question, Can you name any incident discovered by men that has come as a blessing without any element of curse? Definitely 'No' is the answer. For every incident, we have a poison along with the 'Amrita'. The Samudra Manthan episode has given us bowls of Amrita along with poison. Unfortunately science has to bear the epithet of hazard making.

Now the question is what is hazard? Hazard may be defined as the unwanted difficulty which a person has to face while achieving his goal. It may be classified as (a) social (b) political (c) scientific depending on the circumstance. Scientific, hazard can be categorised as the worst possible one as we cannot keep ourselves alienated from the proceedings.

Think for our ancestors who had to compromise with the catastrophies of nature without any roof to live under. '**Asbestos**' appeared as a saviour to them. Apart from this, asbestos is commercially acceptable due to its special physical and chemical properties. It acts as a very good heat insulator in high temperature conditions specially for workers in furnaces. Since it has a low electrical conductivity, it finds its use in the manufacture of electrical gadgets. Owing to fire resistivity, asbestos acts as a helpful material for fireworkers. It also has a special physical property which makes it suitable for weaving. Ironically science and chemistry in particular, responsible for bringing about resurgence in the development of man and industry has a hidden curse lying underneath every revolution which it holds itself responsible. Therefore the long awaited joy with every new discovery turns out to be a pathos to man.

Asbestos minerals come from two different groups of compounds defining two classes of silicates.

(a) Amphiboles (a form of chain silicates)

(b) Sheet silicates.

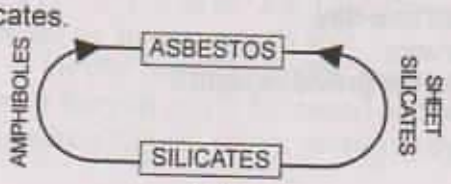

Silicon a member of the Group IV of the Periodic table holds the same versatility as any other member of the group. Generally the compounds containing the silicon and oxygen are called silicates, which include other elements like aluminium, iron, sodium, potassium etc. Notably, ordinary sand is also a silicon compound.

The Silicates may be classified as

(i) Orthosilicates
(ii) Pyrosilicates
(iii) Cyclic Silicates
(iv) Chain silicates
(v) Sheet Silicates
(vi) Three dimensional Silicates.

The Sheet Silicate variety is called the chrysotile, whereas the other five varieties are **chamosite**, **crocidolite**, **fibrous anthophyllite**, **fibrous tremolite** and **actinolite**. Among them chrysotile is of utmost economic importance. Humans are exposed to this mineral during mining, milling, construction and maintenance work. The asbestos minerals readily separate into long fibrils or tubes only a few tens of nanometres in diameter.

There are two separate features of asbestos particle that merit consideration as potentially carcinogenic. They are :-

(i) The chemical nature of the constituents and contaminants specially those with a known potential for carcinogenicity such as the polycyclic hydrocarbon and heavy metals.

(ii) The physical structure of asbestos particles which in their fibrous fineness are somewhat unique in the natural world. The five, long durable fibre is the most critical to carcinogenicity.

Asbestos has been observed to cause four health disorders. It results in the death of many miners. **Lung cancer** has a higher incidence in miners who also smoke, with the chance of developing cancer roughly proportional to the amount smoked. **Asbestos induced cancer** is found only rarely in nonsmokers. Among the various types of asbestos, chrysotile workers have the lowest incidence of cancer. **Mesthelioma** (a tumor of the mesothelial tissue) involves the development of a fatal tumor. The time between diagnosis and original exposure is 30 years or more. Family members of miners are also at risk. Among the general population, 70 - 80% of all mesthelioma cases are caused by exposure to asbestos. A staggering 18% of all mortalities in crocidolite workers are the result of mesthelioma. **Benign pleural changes** also occur to an extent proportional to exposure but rarely cause functional

impairment.

Recent data suggest that amphiboles are the major cause of mesthelioma in asbestos workers. On the basis of medical studies amphiboles are more potent than chrysotile in the induction of fibrotic lung disease and associated lung cancer. The reason for the difference in virulence is that, rod-like amphiboles appear to penetrate the peripheral lung more readily than chrysotile fibres, which are curly. Furthermore, fibres longer than 8 µm and less than 0.25µm in diameter have the most marked carcinogenic potential. This is presumably a result of differing shapes, which means that chrysotile fibres in comparison to amphibole fibres are cleared more from human lungs. In dimensional range of 0.25µm to 8 µm fibres lie free in interstitial tissues, while fibres of smaller dimension are readily phagocytosed and fibres of larger dimension are sequestered by adherent phagocytes and fused phagocytic giant cells. Phagocytosis is the process by which a cell engulfs or absorbs bacteria or foreign particles so as to isolate or destroy them. Fibres that are fine and long may be more carcinogenic than others, simply because they are uncompromised by phagocytic activity. If the carcinogenicity of asbestos depends on its dimensional configuration, durable fibres of other materials in the same dimensional range as asbestos should be carcinogenic and there should be an optimal dimensional range of fibres to carcinogenicity. It is suggested that short and fine fibres are more likely to produce mestheliomas than longer and thicker fibres, but these are within the range of light microscopy and longer than 5 µm. But there are no conclusive studies in man to support that very short fibres are non pathogenic.

When the seriousness of the problem of asbestos related disease became recognized 4o — 45 years ago, it was regarded as arising solely from commercially produced asbestos. One of the first recommendations made by the working group on 'Asbestos and Cancer under the auspices of the **International Union Against Cancer**' in New York October 1964 was that the importance of fibre types on the risk of developing asbestos, carcinoma of lung and other tumors were investigated. Since then the evidence of a casual relationship has been increased by epidemiological studies showing exposure response relations for the incidence of lung carcinomas. The epidemiological evidence in man however supports that there are clear differences in risk with type of fibre and nature of exposure.

The **International Labour Organization** claims asbestos to be still the number one carcinogen in the world. Most of the developed countries have already decreased the use of asbestos to a large scale. In USA, the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has indicated some global regulations, regarding the use of asbestos. But in India, a ban on the use of asbestos took a reverse turn recently. The Ministry of Mines (Govt. of India) has indicated that it may lift the mining ban – the reality being that the country's most powerful Parliamentarians bless the asbestos industry. But scientists fear that in the developing countries, the use of asbestos will prove to be a **health time bomb** in the next twenty to thirty years.

Research shows that the asbestos epidemics across the globe (even in countries where it is currently banned) as a consequence of past exposure has an estimated 30 deaths per day. Recent studies indicate that the frequency of **P-53** tumor suppressor protein accumulation is increased in lung carcinomas of patients with clinical or histological asbestos exposure. Treatment with crocidolite increases the number of P-53 protein expressing units in the human pulmonary epithelial cells and treatment with chrysotile indicates the elevation of P-53 protein level in rat pleural mesothelial cells. In addition, inhaled chrysotile induces the expression of P-53 protein at fibre deposition sites in rat lungs. These findings suggest a possible association between asbestos exposure and accumulation of P-53 protein in pulmonary tissues or cells.

Finally to conclude, much has been accomplished in assessing large protein coated fibres in human lungs. Surprisingly little has been done in assessing the size distribution and total quantity of all fibres in human tissues. This would be a tedious job, but it might determine the true significance of fibres, as carcinogens in man.

Enchanted Islands - An Environmental Profile

Dr. Supatra Sen
Lecturer in Botany
B.Ed. Department

"..... in the sea of life enisled,
With echoing straits between us thrown,
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millions live alone.
The islands feel the enclasping flow,
And then their endless bounds they know ....."

Matthew Arnold

Islands have always fascinated biologists. Representing small, isolated "microcosms" with discrete boundaries, they vary greatly in size, age isolation, shoreline structure, topography and geology. These "isolated ecosystems" may be formed either by the disappearance of a connecting land bridge from the mainland or by land rising from the sea. A land mass could be cut off from the mainland if the sea rises in between or if the joining-land is eroded. For both these instances, the island formed will have the flora and fauna already in place. But for islands rising out of the sea (as a result of volcanic activity), this is not the case. Such land masses await the "colonizers" and later succession-species to cross man hundreds of miles of ocean.

Due to their isolation from more widespread continental species, islands are ideal places for unique species to evolve. The patterns of species distribution can usually be explained through a combination of historical factors such as speciation, extinction, continental drift, glaciations and river capture, in combination with the area and isolation of land masses and available energy supplies.

While **biogeography** is the science which deals with geographic patterns of species distribution and the processes that result in such patterns, **island biogeography** is the study of the distribution and dynamics of species of island environments.

The **Equilibrium Theory of Island Biogeography** is the brain child of Robert Mc Arthur and E.O. Wilson in 1967. The theory holds that the number of species found on an island, designated the **equilibrium number**, is determined by two crucial factors – the effect of distance from the mainland and the effect of island size. These, in turn, would affect the rates of **extinction** and **immigration** on the islands.

The basis of theory supposes that there is a large source area of species and surrounding the source area is a series of islands of different sizes and distances from the source area. Species disperse from the source are to the islands. In the theory's simplest form, species from the source area disperse to an island at a rate known as the **immigration rate**, depending on the distance of the island from the source area. At first, almost every organism arriving on the island will be a new species, so the rate of immigration for the island will be high. As the number of species on the island increases, many of the organisms arriving on the island will be of species already present. So the rate of immigration will decrease and eventually fall almost to zero as the number of species rises.

Species which have colonized the island will simultaneously run the risk of **extinction**. The **extinction rate** rises as the number of species on the island rises. Initially when the number of species on the island is small, the immigration rate exceeds the extinction rate and the number of species is on the rise. As the number rises, the immigration rate is on the decline but the extinction rate shows an upward trend. Eventually a point is reached where the rate of immigration equals the rate of extinction. At this point, the number of species attains an equilibrium. Addition of new species balances the loss of species by extinction. This equilibrium/balance gives the theory its name. The theory predicts that the number of species will be lower on isolated or smaller islands than on closer or larger ones.

One famous "test" of the MacArthur – Wilson theory was provided by Nature herself in 1883 by a catastrophic volcanic explosion that devastated the island of Krakatoa, located between the islands of Sumatra and Java. Though the flora and fauna of this and adjoining islands were nearly exterminated, yet within 25 years thirteen species of birds had successfully re-colonized. Between the explosion and 1934, thirty-four species actually became established, but five also went extinct. During the period from 1934 to 1985, a further fourteen species had become established but parallely eight had gone extinct. As per the predictions of the theory, the rate of immigration reduced as more and more species colonized the island. With approaching equilibrium, the number in the cast remained roughly the same, while the 'actors' gradually changed.

Island biota has certainly been inspirational for evolutionists like Charles Darwin and Alfred Russel Wallace. A striking problem in the validity of the Equilibrium Theory is that it does not include the addition

of species *in situ* by evolution. This is very important especially on islands far from the source of new species. Evolution can increase the number of species on the island without the requirement of immigration. This may make it more difficult for "new arrivals" to colonize successfully as the available niches have already been filled by spécies which have evolved to be a "perfect fit" in each niche.

The apparent rate of evolution on islands is sometimes amazingly rapid. For instance, there are nearly 50 species completely adapted to cave life on the Hawaiian Islands. Each of the five main islands of the archipelago has its own endemic (exclusively native to the biota of a particular place) species. In fact, 70.8% of the ferns and 94.4% of the angiosperms of this region are endemics, which could either be products of evolution or survivors of original mainland species.

The Andaman & Nicobar Islands comprise of a unique luxuriant evergreen tropical rainforest canopy, sheltering a mixed germ plasm bank, comprising of Indian, Myanmarese, Malaysian and endemic floral strain. So far, about 2200 varieties of plants have been recorded, out of which 200 are endemic and 1300 do not occur in mainland India. The islands house some spectacular butterflies of which approximately ten are exclusively endemic. The 14 species of endemic birds include the Andaman Hawk Owl, Andaman Scops Owl, andaman crake (all species endemic), Brown Coucal (all species endemic) *etc.* About 50 varieties of forest mammals occur, some of which including the Andaman wild boar are endemic.

Colonizers arriving on an island group adapt to suit conditions of that particular island that they are to occupy. Such changes result in a group of closely related species on the archipelago. This speciation process is a form of **adaptive radiation**. Darwin noted the striking effects of adaptive radiation in the finches of Galapagos Islands. The variation from island to island in a closely related group of finches which appeared to have a common ancestor drew his attention to the possibility of a selection process resulting in the production of new species. The variation in Galapagos Islands certainly triggered Darwin's thoughts on the "origin of species."

The other major evolutionary feature of islands is the way in which some species take on very unusual forms or structures which are not typical of the group found on the mainland. The lack of predators seems to have resulted in the evolution of ground-foraging flightless birds. A predator being absent flight has become unnecessary and the lack of ground-dwelling mammals has resulted in nil competition

with ample food supply for these birds. Such is the instance in New Zealand where the kiwi and the flightless parrot kakapo occupy the niches of the foraging mammals.

But islands contain not only new species but very old relic species as well. A good example is St. Helena, a volcanic island in the South Atlantic Ocean almost 2000 km. away from the mainland of Africa. The island contains several endemic genera more closely related to genera in Australia, South America, India and Madagascar than to genera in Africa. This island is closer to Africa than to any other land mass. Such a strange distribution suggests that the endemic genera are relics of an earlier period when their ancestors were spread worldwide. The earlier genera survived in Australia, South America, India, Madagascar and St. Helena but went extinct in Africa. The endemic woody members of the daisy family, the Asteraceae in St. Helena are probably descendents of an ancient woody species.

In species diversity, Island Biogeography not only highlights **allopatric speciation** (new gene pools arising out of natural selection in isolated gene pools) but also considers **sympatric speciation** (different species arising from one ancestral species). Thus islands house unique species–relics of the old–the survivors and the products of evolution–the new species.

Though the lessons of island biogeography are age old, they have tremendous implications for the future. The Island Biogeography Theory - aptly termed the '**First Law Conservation Biology**' applied to habitat fragments spurred the development of the fields of **conservation biology** and **landscape ecology**.

Continental species are experiencing an unprecedented level of habitat fragmentation as a result of anthropogenic activities. Suitable habitat is becoming fragmented into small patches located in a "sea" of disturbed land. These small patches function very much like isolated islands in a real sea. Mountains surrounded by low-lying land are also comparable with real islands cut off from one another by water, so mountains are isolated by "seas" of low-lying land. Species located in these habitat fragments become more vulnerable to extinction because of the same factors (small geographic range, low population numbers besides natural causes such as disease, fire and normal population fluctuations) that doom their island cousins. The theory can be a great help in understanding the effects of habitat fragmentation, including forecasting floral and faunal changes caused by fragmenting previously continuous habitat.

By identifying mechanisms underlying the loss of species diversity, Island Biogeography Theory may help suggest ways of designing nature reserves to maximize their ability to maintain diversity. The recommendation that "a single, large reserve protects more biodiversity than several smaller reserves of equal size" has led to the debate known as SLOSS (single large or several small) described by writer David Quammen as 'ecology's own genteel version of trench warfare.'

While certain conservation planners maintain that one large reserve can hold more species than several smaller reserves, and that larger reserves should be the norm in reserve design, other ecologists emphasize that **habitat diversity** is as or even more important than size in determining the number of species protected.

While research in this field forges ahead with classic biogeography expanding with the development of molecular systematics to create an all new discipline of **phylogeography**, the work of Nature also continues relentlessly on these islands. Certain facts even now remain unaccountable by ecological theory, as the work of Nature like her ways is never completely understood or explained.

.....

REFERENCES :

1. Beller, W and P. D'Ayala. Sustainable Development and Environmental Management of Small Islands. Paris, France : UNESCO and Parthenan Publishing Group, 1990.
2. Brown, J.H.Biogeography. Sunderland, M.A.:Sinauer Associates, 1998.
3. Carlquist, S.J.Island Biology. New York, NY:Columbia University Press, 1974.
4. MacArthur, R.H and E.O. Wilson. The Theory of Island Biogeography. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967.
5. Menard, H.W.Islands. New York : Scientific American Library. 1986.
6. Nunn, P.D. Oceanic Islands. Cambridge, M.A.: Blackwell, 1994.
7. Quammen, D. The Song of the Dodo : Island Biogeography in an Age of Extinctions. New York, NY : Scribner, 1996.

Section IV

Commerce

P

Special Economic Zones – Issues and Challange

– Dipak Kumar Nath

A discussion of special economic zones in India will necessarily involves certain subjectives assessments of the policy rationale, its impact and implementation, based on the experience of other countries where such policies have been implemented for a long period and the views of experts who have analysed the implications thereof. Some postulates and predictive thinking may be inescapable in view of the absence of direct local experience.

SEZ is not necessarily a term that has a definitive connotation though, over years and based on the approach of many countries, it has come to signify certain well-identified features. It is not improper to use SEZ in the place of terms like EPZ (export promotion zone) and FTZ (free trade zone). All these provide or impart slightly differing policy flavours to what is otherwise an ubiquitous concept.

Defining features

Broadly SEZ has certain defining features such as special tax incentives; duty free movement of goods and services; world-class infrastructure; construction intensive nature; export orientation; differentiated economic management like relaxations in certain basic restrictions applicable to the rest of the economy; and free inflow of foreign capital.

The above are not official definitions, but no one familiar with the concept of SEZ, can deny these features. It is important to appreciate that such zones have regulations on the activities carried on, and are not to be mistaken as areas that do not have any from of restrictions. It is often a controlled economic environment for free trade.

Historical perspective

According to an article written in 2000 by Robert C Hayword, Director, World Economic Processing Zones Association (www.wepza.org), the concept of free economic zones dates back to 300 BC. The author notes that such enclaves were found in the Phoenician city of Tyre in the Greek island of Delos. The city became very wealthy as a result of such policies and was viewed as a challenge to the centralism of the Roman Empire.

According to the Wepza Website, more than 2,000 zones are said to exist in over 120 countries. These are found in various countries following all known systems of economic management. They are in high, low and middle-income countries, having capitalist,

socialist or communist oriented ecnomics. Such has been the irresistible pull of the concept to promote economic growth.

The evolution of these zones owes to the fact that traditionally governance has sought to apply much rigidity to the way of business is conducted and governments have sought to relax this in designated zones to promote specific forms of economic activity. China was possibly the most closed and authoritarian economic system in the world in the 1970s and early 1980s. It could not liberalise its economy as its political system did not allow it. So, it created pockets of economic freedom in the form of SEZs, which at times exceeded some small countries in their geographical spread. These pockets were a world apart from the rest of the country in terms of economic system and philosophy. Similar is the example of Dubai, a part of the Emirates that almost exists as an SEZ in itself, though it also has designated areas like the Jebel Ali Zone.

Ironically, world bodies responsible for administrating and advocating global policy initiatives such as the IMF, World Bank, OECD and IOL have reservations about the benifits of such exclusive economic enclaves that liberalise selectively but involves costs for the economies in the form of revenue losses and regional imbalances and instead advocate across-the-board liberalisation.

Earlier initiatives

Around the time the Chinese started their SEZ initiatives in the early 1980s, India pitched in with its nascent export enclaves. Over time six EPZs were created in places that had access to seaports. Parallelly 100 per cent EOU and similar schemes were unveiled. Over the next two decades, there was a plethora of schemes focussed on export promotion. The broad strain in all these was tax and duly exemptions with limited relaxation on foreign exchange transactions.

Unlike China, that coupled liberalisation in FDI with SEZ initiatives, India missed the opportunity to attract FDI when it made half-hearted attempts to promote export zones. Another stark distinction lay in the fact that the Chinese SEZ involved gigantic infrastructure creation, which attracted its own share of FDI. The China model of SEZ with complete sovereignty in governance was not thought of in India at any stage.

The years of fairly muddle and hotchpotch efforts to generate clusters of Industries sharing common infrastructure, that delivered very little value in export or growth terms culminated in the policy on SEZ in 2005.

Current scene

The policy had a bad start with converting six existing EPZs into SEZs. They were already languishing from years of neglect and the state of the infrastructure in these was poor. The combind export turnover from all these was less than 10-12 per cent of the country's exports.

It was more an act of convenience to revive the fortunes of these centres. The largest of them was not more than 10 per cent the size of the smallest SEZs in China. Size and infrastructure that characterise Sezs in the rest of the world were never in the minds of the policy makers here. The only change in the SEZ scheme as compared to EPZ / EOUs is that no export obligation is mandated, though net foreign exchange earning is a pre-requisite. The latter condition defies logic since SEZ as a concept has over time lost foreign exchange earning as a key imperative and in the Indian context it has little value given the current moves on capital account convertibility.

Thus a SEZ unit can cater solely to the domestic market after paying the customs duty applicable to the item at the time of clearance. The other difference between the old schemes and SEZ is the benefit of duty exemption available for construction of the zone. This was missing in the EOU / EPZ schemes and cannot be viewed as a major benefit conferred. However, it will be seen later in this articles how this may not benefit the industry set up in SEZ much, but is arbitraged by the real estate owner.

Contemporary rationale

A pertinent question that can arise for consideration is whether the new policy on SEZ has a distinctly different rationale or objective from the approach of the earlier policies that failed to deliver any significant advantage for the country as compared to similar policies of the Philippines, Taiwan or Korea, not to mention China's far superior strategy.

The Indian policy lacks a grandiose purpose either in terms of creating a completely different type of infrastructure or an industry focus that would attract significant foreign capital as in the case of other countries. The investment that is slated to find its way into the new SEZ enclaves would have come any way into the country if the existing scheme of tax holiday as applicable to export oriented units had continued. In fact , the quantum and actually that quantum of investment would have to be much more if other policy liberalisations had happened in tandem.

The support for this, rather pessimistic view is found in the fact that out of 267 cases cleared till September 30, 2006 by the Board of Approvals, 133 cases are SEZs of less than 0.4 square miles in area and only about five are of any internationally significant size. The smaller SEZs for IT/ITES (the minimum prescribed area of 10 hectares) constitute nearly 53 per cent of the total approved cases. This exemplifies the fact that no significant large infrastructure creation is either possible or likely to arise, which has successfully been the engine of growth in the SEZ phenomenon across the globe.

The reason for such a large number of projects in the IT sectors is fact that income tax benefits for this sector are expiring in March 2009 and by converting or migrating the operations that currently enjoy the tax holiday into SEZs, the industry hopes to enjoy the tax holiday further periods allowed under the policy. This is an unfortunate and perverse development where the SEZ route is exploited by an industry that neither creates nor requires any significant infrastructure for its operations. These businesses that are currently scattered in different parts to various cities may now congregate into designated SEZs for continuing the tax benefits, adding to the pressure on urban infrastructure.

It could have never been on the wish list of the IT industry that it required continued tax subsidy for its progress, nor was the absence of tax holiday seen as a hurdle in attracting fresh investment in this. Thus the SEZ, which significantly catalysed infrastructure and industrial investment in other countries, may end up creating dismal IT complexes and multi-storied buildings in India with the sole objective of continuing tax exemption. If the tax exemption for software technology park units gets extended, the significant number of SEZ proposals will evaporate. The only logic for the SEZ scheme could be the position adopted that it is more compatible with the WTO regime as compared to other schemes in place. This also is an unverified verified proposition to serve as the basis for justifying or providing the rationale for the current policy. In fact the current scheme that provides pro rata exemption of income taxes to SEZ units based on export turnover is more likely to be viewed as a subsidy under the SCM clause of WTO and countervailed by the importing countries as it happened in the case of EPZ and EOU units.

To round off the discussion on the rationale for SEZs, it will be profitable to understand the imperatives that seem to exist in other countries that have more successfully adopted this model. One of the key reason for setting up SEZs was the need to provide a high degree of economic freedom in an otherwise restricted regime. The

compulsions could have been either in terms of high duty and tax structure applicable in that country, or limitation on free use of exchange, or freedom for foreign investments.

Another factor that has driven SEZs was the need to relax rigid labour laws which could not be done on a national scale. It is also a fact that countries saw significant benefits in using SEZs for opening up the economy in a limited fashion to handle political oppositions while hoping that technology and skill transferred by this process would have backward linkages to the rest of the economy.

These benefits worked meaningfully in situations that existed more than a decade ago in many developing countries. The economic liberalisation that has happened in recent years, voluntarily or through compulsion from agencies such as WTO or IMF, have to large extent limited the validity of this rationale.

Even in the Indian economy that has liberalised at a slower pace when compared to many others, many of the above aspects would appear misplaced or inapplicable. The biggest benefit that countries like China saw in their SEZ policy was the creation of massive infrastructure in identified places. In India, given the average size of the approved SEZs, infrastructure creation is most unlikely to be a driving force in this process.

Land acquisition issue

Having dealt with the aspects of the need and rationale above, it is important to complete this analysis of SEZ by dealing with concerns that have surfaced, some of them taking a serious turn in the context of SEZ implementation in India. The concern that the Government itself has expressed through the Finance Ministry is on account of loss of revenue through duty concessions conferred under this. Some of the figures toted up by the Government look suspect.

As mentioned earlier in this article, the SEZ policy has only one extra concession that was missing in the earlier policies – the duty and tax exemption for the developer. This alone cannot amount to the sum mentioned in this regard. All other tax and duty concessions for the SEZ units always existed for EOU and EPZ schemes and thereby cannot be viewed as incremental revenue loss. In other words, if EOU and EPZ schemes continued to attract the same level of investment as SEZ at present has, the revenue loss cannot be viewed as arising on account of SEZ policy.

The other concern that has taken serious dimensions is the way land acquisition for SEZs has been happening. It is a fallacy to view SEZs as a reason for exploitation of poor agricultural landowners

because of land acquisition. Land acquisition for industrial use is an existing phenomenon and unfortunately the Constitution was amended to exclude the right to property as a fundamental right, sanctifying acquisition of land by the Government for any purpose. Any form of land acquisition other than for ostensible public purpose like building of a road, a bridge or the like should never have been allowed unless the process was carried out transparently through public bidding.

In other words, if land was required to facilitate setting up of private business, the Government should have only acted as a facilitator in a bidding process that would help bring out the real potential value that could be encashed by the land owners. The current procedure of fixing a compensation based on current use of the land (which does not recognise the converted use) is completely colonial and most unfair. SEZs may have accentuated this phenomenon; but it is nothing exclusive to that policy. It is unfortunate that the laws in this regard in a so called liberal democracy is more antagonistic to the interests of the citizens than in highly authoritarian regimes like Russia and China.

Another issue for discussion is the opportunity for real estate leverage created through the SEZ phenomenon. By virtue of the fact the SEZs are select domains for tax breaks and that the developer can claim tax and duty benefits together with an opportunity to acquire land at cheaper rates (as explained above) this policy has unfortunately become a tool for real estate gamble. The developers are seen to be seeking premium rental value for SEZ facilities when their cost of development is subsidised by the Government and is much less than non-SEZ facilities. This artificial arbitrage, enabled by tax concessions to the developer, coupled with the ability to command a premium on rent from user units, has led to the phenomenon of most SEZ projects being promoted by popular real estate players rather than by serious infrastructure agencies or organisations. Allowing SEZs of size as small as 25 acres is the cause of the above leverage.

Prospects

If the SEZ policy is to provide a real economic impetus especially in the form of creation of world-class infrastructure, the minimum size should be fixed at 1,000 hectares or the minimum investment at Rs. 10,000 crore. If the right price is paid for acquiring land through open bidding land of any size may be available. Otherwise, the current phenomenon of mushrooming SEZs in and around major cities will only add to the pressure on the already weak urban infrastructure and will result in migration of people to cities when the objective should be a reversal of this trend.